দুটি প্রতীক্ষার কারণে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রজ্ঞা

এ ১২৫, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রজ্ঞা প্রকাশনের পক্ষে অরূপ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল সরকার ও অতনু পাল কর্তৃক এ-১২৫ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত ও নিউ রামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

ডঃ বিশ্বনাথ রায়

অনুজপ্রতিমেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

পরকপালে রাজারানী (দুই খণ্ড)

এক রমণীর যুদ্ধ

বাসকশয়ন

পুরুষোত্তম

সজনীর রাত পোহালো

সবুজ তোরণ ছাড়িয়ে

আবার আমি আসব

দিনকাল

আরো একজন

মেঘের মিনার

আনন্দরূপ

অপরিচিতের মুখ

রূপের হাটে বিকিকিনি

নিষিদ্ধ বই

হীরামঞ্জিল

খনির নতুন মণি

সিকেপিকেটিকে

ফয়সালা

পিনডিদার গপপো

লিডার বটে পিনডিদা

পিনডিদার পঞ্চবান

দুটি প্রতীক্ষার কারণে

সুমিতার হাত থেকে খামটা নিয়ে অবনীশ দত্ত উল্টে-পাল্টে দেখল। পোস্ট্ অফিসের ছাপ অস্পষ্ট। কোথা থেকে আসছে সঠিক বোঝা গেল না। পরিচ্ছন্ন গোটা-গোটা অক্ষরে তার নাম আর ঠিকানা লেখা। লেখার এই ছাঁদও অচেনা। স্ত্রীর মন্তব্যে সায় দিয়ে বলল, মেয়েছেলের লেখা তো বটেই—মুখের দিকে ভালো করে তাকানো যায় না এমন কোনো মেয়েছেলের হবে। নিরীহ মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, তাই মনে হয় না?

কথা থেকে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের হদিস মিললেও কি যে বলতে চায় স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে মুখ দেখে সুমিতা একটু অনুমান করে নিল খামটা কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে এসেছে তার ভদ্রলোকটি ঠাওর করতে পারেনি। স্বামীটি সবে ট্যুর থেকে ফিরেছে, বেশ কিছুদিনের অদর্শনের অবসানে চায়ের পেয়ালা মুখে তুলে সকালের শুরুটা সরল করে তুলতে তারও আপত্তি নেই। প্রতিবাদের সুরে বলল, কক্ষনো না, এমন মুক্তোর মতো হাতের লেখা যখন রূপসী কেউ হবে—আমাকে ফাঁকি দিয়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াও, কোথায় কার সঙ্গে কি কাণ্ড চলেছে কে জানে। খুলে দেখো নয়ন-মন জুড়াবে। না কি আমার সামনে খুলতেই চাও না?

ছেলে মেয়ে কাছে না থাকলে আর অবকাশ থাকলে সামান্য উপলক্ষও রঙে-রসে ভরাট করে তুলতে সুপটু দু'জনেই। অবনীশ দত্তর বয়েস চুয়াল্লিশ আর সুমিতা দত্তর উনচল্লিশ। বোঝা না গেলেও সবসময় তা ভোলা যায় না। কিন্তু ফাঁক পেলে দু'জনের কারোই সেটা ভুলতে আপত্তি নেই।

খাম সামনে রেখে মুখের দিকে চেয়ে অবনীশ দত্ত গম্ভীর চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মতে তাহলে রূপসীরা সব বনে-বাদাড়ে বাস করে আজকাল?

যুক্তির অভাব বোধ করা সত্ত্বেও সুমিতা চোখে চোখ রেখে একই সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল, করতে পারে, কুৎসিত মেয়ের অত সুন্দর হাতের লেখা হয় ?

বলার সঙ্গে সঙ্গে সুমিতা নিজেই ভিতরে ভিতরে অপ্রস্তুত একটু। অবধারিত কোনো জবাব আসছে এবারে খেয়াল হতে সময় লাগল না। এলোও।

সানন্দে নড়েচড়ে বসে অবনীশ দত্ত জোরালো জবাব দিল, আলবত হয়। কুৎসিৎ মেয়ের হাতের লেখা ইনভেরিয়েবলি সুন্দর হবে, আর রূপসী মেয়ের তার উল্টো।...উঃ! কি দিনই গেছে বিলেতে থাকতে, এক-একখানা চিঠি পড়তে গলদঘর্ম হয়ে শেষে ডিসাইফার করার জন্য প্রশান্তর কাছে ছুটতে হত—

এই এক মানুষের নাম অবনীশ দত্তর মজা বাড়াবার জন্য করে বসেনি। আপনি ঠোঁটের ডগায় এসে গেছে।

কিন্তু নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অবনীশের নিজেরই ভিতরে ভিতরে কি একটা ষষ্ঠ অনুভূতির তরঙ্গ খেলে গেল যেন। দেখতে দেখতে মুখ থেকে সরল কৌতুকের ছায়া সরে গেল। সামনের ছোট টেবিল থেকে সাগ্রহে খামটা তুলে নিল।

পরিবর্তনটুকু সুমিতার নজর এড়ালো না। সে রূপসী না হোক, সুরূপা যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে রূপ এখনো একেবারে ভাঁটার দিকে গড়ায়নি। কিন্তু তার হাতের লেখা আবার তেমনি খারাপ। একটু আগের ঠেসের লক্ষ্য সে নিজেই—হাতের লেখার জন্য আগে আগে অবনীশ ছদ্ম কলহের চেষ্টা দেখাত, বলত তুমি বি, এ পাশ করেছ বিশ্বাস করি না, য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেট দেখাও!

সরস বিতণ্ডা আজও আরও একটু জমে উঠতে পারত। তার বদলে হঠাৎ সাগ্রহে খাম টেনে নেওয়া আর তারপর চিঠি পড়ার তন্ময়তা দেখে সুমিতা কৌতূহল দমন করতে পারল না। উঠে এসে এক পায়ে ভর করে অবনীশের ইজি-চেয়ারের হাতলে বসল। তারপর ঝুঁকে চিঠির মাথায় ঠিকানাটা দেখেই তেমনি হঠাৎ-আগ্রহে একটু

বাধা সৃষ্টি না করে পারল না। খপ করে চিঠিটা টেনে নেবার লোভ সামলে ভদ্রলোকের পড়ার মাঝখানেই তিন পাতা চিঠির তলার দিকটা উল্টে নামটা দেখে নিল। পরক্ষণে উত্তেজনায় বলে উঠল, ও-মা, রমা লিখেছে! আমার তো হাতের লেখা দেখেই চেনা উচিত ছিল!

তর সয় না। এ-রকম অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চকর ব্যাপার আর যেন হয় না। গা ঘেঁষে বসে বুকের কাছে মাথা নুইয়ে সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু করে দিল সেও।

—'অবনীশবাবু, হঠাৎ এ-চিঠি পেয়ে যত না অবাক হবেন তার থেকে হয়তো বিব্রত বোধ করবেন বেশি। আপনি কাজের মানুষ, আর সুমিতাও সংসার নিয়ে ব্যস্ত, এর মধ্যে আপনাদের উত্ত্যক্ত করতে কত যে সংকোচ কি বলব। তবু, দিনের পর দিন মাসের পর মাস ক্ষত এত গভীরের দিকে চলেছে যে না লিখে পারা গেল না।

আপনার বন্ধু অসুস্থ। তাঁকে এখান থেকে সরানো দরকার। আজ প্রায় ন'মাস হল ঘুরে ফিরে এখানে আছেন তিনি। আগে একসঙ্গে এতদিন কখনো থাকেননি।...এর মধ্যে তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে কেউ খবর নেননি। আপনি বা সুমিতা সেখানে তাঁর খবর নিয়েছেন কিনা জানি না! আমি তাঁকে আপনাদের কাছে, বিশেষ করে আপনার কাছেই ঠেলে পাঠাতে চেষ্টা করে হার মেনেছি। আপনার বন্ধু কখনো রেগে ওঠেন, কখনো হাসেন। দুই-ই বড় অবুঝ আর নির্দয়। সহ্য করা কঠিন হয়। যাবার কথা তুললেই আপনার বন্ধু বলেন, কলকাতার সব-কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েই এবারে এখানে চলে এসেছেন, আর এখান থেকে নড়ার ইচ্ছে নেই।

এ-যন্ত্রণা আমার প্রাপ্য আমি জানি। এখানে তাঁকে প্রথম দেখার পরেই এ-জন্য প্রস্তুতও হয়েছিলাম। যন্ত্রণাকে আমি ভয় করিনে।...আপনার সেবারের দরদমাখা কথাগুলো আমার মনে আছে। বলেছিলেন, সূর্য জগতে আলো বিলোয় কিন্তু নিজে জ্বলে। অর্থাৎ আমার যন্ত্রণাও আপনি অসার্থক ভাবেননি। আপনার

কথাগুলো এতদিন পরেও আশীর্বাদের মতো কানে লেগে আছে। কিন্তু চোখের ওপর যন্ত্রণায় যখন আর একজনকে কুঁকড়ে যেতে দেখি এত বছরের এই মাশুল গোণাটা একেবারে ব্যর্থ মনে হয়। না, আমি তাঁর মানসিক যন্ত্রণার কথা লিখছি না, দেহের যন্ত্রণার কথাই বলছি। দিনে দিনে সেটা বাড়ছেই। একেবারে অচল হলে তখন এখানকার এই হাসপাতালে টেনে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু একটু উপশম হতে না হতে আবার যে অত্যাচার শুরু করেন সেটা আত্মহত্যার সামিল। তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এও আমাকে দেখতে হবে? ভুলের এই দামও দিতে হবে? তার আগে ক্ষমা নেই?

…প্রশ্নটা আমি আপনার বন্ধুকেও করেছিলাম। উনি খুব একটা প্রকৃতিস্থ ছিলেন না তখন। অসহিষ্ণু বিরক্তিতে জবাব দিয়েছেন, কোনটা যে তোমার অভিনয় আর কোনটা নয় আজও বোঝা দায়। হেসেছেন—হেসে হেসে আমাকে বিঁধতে চেষ্টা করেছেন। তারপর হয়তো বা বুঝতেও চেষ্টা করেছেন, বলেছেন, তোমার ভুলই বা কি আর ক্ষমাই বা কি। একটা দুটো ছেলে-পুলে হলেই শুনি কর্তার দিকে আর তেমন মন থাকে না গৃহিণীর…একটা দুটো ছেড়ে তোমার তো ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলে-মেয়ে। তোমার জগতে আর আমার জায়গা হওয়া দূরের কথা, আমি তোমার চক্ষুশূল এখন—আমার জন্য তোমার মাতৃগর্ব খর্ব হচ্ছে সেটা আমি বেশ বুঝি।

…এখানে আমার অনেক ছেলে-মেয়ে সত্যি কথাই। আপনি নিজেই দেখেছেন, আর যা দেখে গেছেন এখন তার থেকেও বেড়েছে। আমার ওই ছেলে-মেয়েরা আমাকে বিশ্বাস করে আর ভালোবেসে শ্রদ্ধার উঁচু আসনে বসিয়েছে। নিজের জন্য নয়, ওদের মুখ চেয়েই সেখান থেকে আমি নেমে আসতে পারিনি বা পারা সম্ভব নয়, এও আপনার বন্ধুকে বোঝানোর চেষ্টা নিরর্থক। তাঁর চাল-চলন আচরণ ওই নিরক্ষর ছেলে-মেয়েদের কাছে কোনো সময় অশোভন কোনো সময় বা নির্দয় ঠেকে। বিশেষ করে আমার প্রতি আপনার বন্ধুর ব্যবহার ওদের মনঃপুত না হলেই ওরা তাঁর ওপর রেখে যায়। সেটা

আপনি গেল বারেই কিছুটা টের পেয়েছেন। ওদের এই অসন্তোষও দিনকে দিন বাড়ছেই। এও এখন একটা বড় অশান্তি আর দুর্ভাবনার কারণ আমার।

…যাক, আপনার বন্ধুর অসুস্থতার কথা বিস্তৃতভাবে মল্লিকাকেই লিখব কিনা অনেক ভেবেছিলাম। কিন্তু যতটুকু শুনেছি তার সম্পর্কে, মনে হয় তাতে কোনো ফল হবে না। তাঁকে লেখার কথা বললে আপনার বন্ধুর মাথা আরো বেশি বিগড়ে যায়। আমাকে আক্কেল দেবার জন্য নিজের ওপর আরো বেশি অত্যাচার শুরু করেন। কিন্তু আপনারা ভালো মনে করলে তাও লিখতে পারি—আমার কোনো লজ্জা বা সংকোচ নেই। সব থেকে ভালো হয় সম্ভবত আপনি আর সুমিতা যদি মল্লিকাকে একটু বুঝিয়ে বলেন। সুমিতার সুবিধে হবে কি না জানি না, কিন্তু মল্লিকাকে নিয়ে আপনার একান্তই একবার এখানে আসা দরকার। নয়তো অনেক দেরী হয়ে যাবার ভয়। মল্লিকাকে আপনি এটুকুই বুঝিয়ে বলুন। তাকে আমি কথা দিতে পারি এখানে এসে আমার মুখ দেখার বিরক্তিটুকুও ভোগ করতে হবে না। সে শুধু তার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে যাক। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালো চিকিৎসা করে নিরাময় করে তুলুক। শুধু এটুকুর জন্যে আমি তার কাছে চির ঋণী আর চির কৃতজ্ঞ থাকব। সভ্য জগতের প্রায় বাইরের এই ছোট হাসপাতালে ভালো চিকিৎসারও কোনো ব্যবস্থা নেই।

…সবই লিখলাম। এখন আপনার বিবেচনার প্রতীক্ষা আর আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনাদের মঙ্গল হোক।'

—রমা।

সুমিতা আর অবনীশের প্রায় একসঙ্গেই চিঠি পড়া শেষ হল। তারপর দু'জনেই নির্বাক খানিকক্ষণ। ঘরের বাতাসও যেন স্তব্ধ সেই সঙ্গে। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে আছে।

সুমিতা চেয়ারের হাতল ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। একজনের বেদনার স্পর্শে তার বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠেছে। চোখের কোণ দুটো সিরসির করছে। এই চিঠি যে পাঠিয়েছে, আজ দীর্ঘ দশ বছর হয়ে গেল সে অনেক—অনেক দূরে চলে গেছে। এই সভ্য জগতে আর কোনোদিন তার খবর পৌঁছুত কিনা সন্দেহ। অন্তরঙ্গ-জনেরাও তাকে ভুলতে বসেছিল। কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে সে-রকম নয়। মানুষের হাতে টানা যবনিকা বড় আশ্চর্যভাবে আবার উঠেছে। নাটকের এই মর্মান্তিক অধ্যায়ের শেষ কোথায় সেটা কারো জানা নেই।

…একদিন বড় অপ্রত্যাশিত খবর এসেছে, মালবী মিত্র মরেছে কিন্তু রমা মিত্র বেঁচে আছে। খুব বেশি দিনের কথা নয় সেটা। খবরটা এনেছিল সুমিতারই ঘরের মানুষ এই অবনীশ। চাপা উত্তেজনার সে এক বিচিত্র মূর্তি দেখেছিল সুমিতা।

…পরে মনে হয়েছে খবরটা না পেলেই বোধকরি সব-দিক থেকে ভালো হত।

চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে সামনের টেবিলে রাখল অবনীশ। মুখে ব্যথার ছায়া তারও। চিন্তাচ্ছন্ন। বিমনা দুই চোখ স্ত্রীর মুখের ওপর উঠে এলো। সমস্যার সমাধান হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

সুমিতা জিজ্ঞাসা করল, কি করবে এখন?

—তুমি বলো।

সুমিতা বলল, যা লিখেছে ভাবনার কথা, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি প্রশান্তদার থেকেও রমাকে বেশি দেখতে ইচ্ছে করছে। যাক, আমি বাপু যেতে-টেতে পারব না। ভাবতেই এত খারাপ লাগছে, গিয়ে শেষে নিজেই ঠিক থাকতে পারব না। …যতো শিগগীর পারো তুমি রওনা হয়ে যাও, বেশিরকম মুশকিলে না পড়লে রমা কক্ষনো এ-চিঠি লিখত না। তুমি ছুটি পাবে তো এখন?

—সে কথাই ভাবছি, এই তো সেদিন ট্যুর থেকে ফিরলাম, মাস-খানেকের আগে বেরুতে পারব বলে মনে হয় না। …দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু মল্লিকাকে কি বলা যাবে?

—বলবে আবার কি, আর বলে লাভই বা কি। তাকে জানলে রমা অত করে তাকে নিয়ে যেতে লিখত না। জবাবের মধ্যে ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠলেও মুখখানা শেষে বিষণ্ণই হয়ে উঠল সুমিতার। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, বড় লোকের তেজী মেয়ে··· ব্যাপার-স্যাপার বোঝার পর হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, কিন্তু তারই বা দোষ দেব কি, সবই প্রশান্তদার অদৃষ্ট, নইলে কি লোক দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল।

অবনীশের কানে সবটা গেল কিনা সন্দেহ। সে ভাবছে। খানিক বাদে মন স্থির করে বলল, রমা যখন এই রকম করে লিখেছে ব্যাপারটা সীরিয়াস সন্দেহ নেই, নইলে হুট করে কারো সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখার মেয়ে সে নয়। আমাদের যা করা উচিত তাই করতে হবে। ···মল্লিকাকে এ-চিঠি দেখাতে হবে, তারপর সে যা ভালো বোঝে করবে—

—কি আবার করবে, যেতে বললেই সে যাবে ভাবছ নাকি? মাঝখান থেকে আবার এক প্রস্থ রাগারাগি শুরু করবে। এমনিতেই তো যে চোখে দেখে আমাদের—প্রশান্তদার সব অপরাধের আমরাও যেন ভাগীদার।

—তাহলেও এ-চিঠি তার দেখা দরকার।

খামটা টেবিলের ওপর থেকে আবার টেনে নিল অবনীশ দত্ত। চিঠিটা বার করল। অন্যমনস্কভাবে একটু নাড়াচাড়া করে ছাড়াছাড়া-ভাবে খানিকটা করে পড়তে লাগল আবার। কিন্তু আসল চোখ দুটো তার অন্যত্র উধাও। মনটাও।···কলকাতা ছাড়িয়ে, বাংলাদেশ পেরিয়ে দূর-দূরান্ত পাড়ি দিলে সবুজ অরণ্যলোক আর দুর্গম পর্বত অঞ্চলের মধ্যে ছোট্ট একটা গ্রাম।

···গ্রামের নাম বিঠল।

সভ্যতার আলো আজও সেখানে তেমন করে ঢোকার পথ পায়নি। চাকরির দায়ে অবনীশ দত্ত অনেক অজানা অচেনা জায়গায় পা দিয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু বিঠলে পা দিলে মনে হবে ইতিহাসের প্রায়

একটা আদিম অধ্যায় এই যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজও যেন সেখানে নড়াচড়া ঘোরাফেরা করছে।

অথচ সভ্যতার সড়ক খুব একটা দূরেও নয় ওই গ্রাম থেকে।

অবনীশ দত্ত সরকারের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের বেশ বড়সড় অফিসার একজন। বড় হলেও একটানা ঘরে বসে কাজ করতে হলে হাঁপিয়ে ওঠে। বছরের মধ্যে কম করে পাঁচ মাস সরকারী কাজে সারা ভারতের পাহাড়ী জঙ্গল আর পাহাড়ী নদী-নালার বহু এলাকা চষে বেড়াতে হয়। সে যে পোস্টএ আছে এখন, এত ঘোরাঘুরি না করলেও চলে। তার নির্দেশে দশ-বিশ জন সহকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারে। কিন্তু সেরকম নির্দেশ বড় একটা দিতে চায় না বলে সুমিতার অনুযোগ শুনতে হয় প্রায়ই।

আসল কথা পাহাড়ী নদী-নালা বন জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে তার ভালো লাগে। কর্মজীবনের শুরু থেকে তাই করে আসছে, আর এই করেই প্রকৃতিই এই রুক্ষ নির্জন দিকটা তার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। পাহাড় আর জঙ্গল টানে তাকে। ইদানীং কলকাতা থেকে বেরোয় যখন বড় কাজ আর বড় দলের কর্ণধার হিসেবেই বেরুতেই হয় তাকে। সঙ্গে নানা পর্যায়ের অভিজ্ঞ সহকারী থাকে বেশ জনাকতক। লক্ষ্যস্থলে এসে জঙ্গলের মধ্যেই ক্যাম্প করে দিন যাপন করে থাকে সকলে মিলে। তেমন বড় কাজ হলে এক-টানা দেড় মাস দু'মাসও থেকে যেতে হয় সকলকে। স্বয়ং কর্ণধার সঙ্গে থাকলে কারো মুখ ভার হয় না। এই কারণেই তারাও তাকে ভালোবাসে। অবনীশের নিজস্ব হেপাজতে সরকারী জিপ থাকে একটা। সেই জিপ-এ করে সে দূরের সার্কিট হাউস বা ডাকবাংলো থেকে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু তা করে না বড় একটা। সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতেই ভালো-লাগে।

প্রকৃতির এই নির্জন নিভৃতের অন্তরঙ্গ সাহচর্য তার একটা লোভনীয় আকর্ষণ। কাজ যখন চলতে থাকে, অনেক সময় অবনীশ দত্ত তখন জিপ ছেড়ে পায়ে হেঁটেই কোথা থেকে কোথায় চলে যায় ঠিক নেই। এমনও হয়েছে দিন দুই তিন হয়তো ফিরলই না। সহকারীরা তাদের বড় কর্তার জন্যে এখন আর উতলা হয় না। স্নেহভাজনরা আগে সুমিতার কাছেও নালিশ করেছে এজন্য। জঙ্গলে কত রকমের জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব দেখা যায়। কিন্তু সুমিতাও স্বামীর স্বভাব শুধরোতে পারেনি। কুলী-মজুরদের সকলেই সাধারণত স্থানীয় আদিবাসী রিক্রুট। নতুন জায়গায় হানা দেবার দিন কয়েকের মধ্যে তারাও জেনে যায় খোদ সাহেবটি বন-জঙ্গল বড় ভালোবাসে। তাই তারাও তাকে পছন্দ করে আর কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

...বছর আড়াই আগে একটা বড় রকমের রিসার্চের কাজ পরিদর্শনের জন্য অবনীশ দত্ত হিমালয়ের এই পার্বত্য অরণ্যলোকে এসেছিল। রিসার্চ ক্যাম্প তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই চালু হয়েছিল সেখানে। মাঝখানে পরামর্শ আর নির্দেশ দেবার জন্য তার আসা। এদিকটায় নতুন অভিযান শুরু হয়েছে। আগে আর এ-অঞ্চলে পদার্পণের সুযোগ মেলেনি। তাই ফাঁক পেয়েই চলে এসেছে। ছ' সাত দিনের মধ্যেই ফিরে যাবার কথা ছিল। তার প্রয়োজনও যথা সময়েই ফুরিয়ে ছিল।

...কিন্তু অবনীশ দত্ত এক অভাবিত যোগাযোগে আরো দিন পাঁচ-ছয় বেশি থেকে গেছল। ঠিক এই জায়গায় নয়, কাছাকাছি কোনো এক গ্রামে—নাম যার বিঠল। এই থাকার সঙ্গে সরকারী কাজের কোনো সম্পর্ক নেই।

নিজের দায়িত্ব শেষ করার পর স্থানীয় বুড়ো গাইড পারেখকে সঙ্গে করে একদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল অবনীশ দত্ত। হেঁটে নয় জিপে। পাহাড় আর জঙ্গল ঘেঁষে অনেকটা দূরে চলে এসেছিল। তখনো উদ্দেশ্যশূন্য, চোখের ভোজই একমাত্র লক্ষ্য শুধু। কিন্তু

ওপরঅলার ইচ্ছেটা অন্যরকম। নতুন সরকারী সড়ক হয়েছে ফলে দূর দূর গাঁয়ের লোকেরা বাইরের দুনিয়ার খবর পাচ্ছে আজকাল।

এক জায়গায় এসে পারেখ এমনি কথায় কথায় জানালো, সামনের ওই জঙ্গল পেরিয়ে আরো মাইল দেড় দুই গেলে বিঠল গাঁ। সেখানে অনেকদিন হল এক 'বংগালী' মাইজি থাকে। সেখানে ছোট্ট একটা হাসপাতাল করেছে আর বর্ষায় এক-একবার অমৃত্ গঙ্গা গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায় বলে বাইরের এন্‌জিনিয়ার ডাকিয়ে ওই মাইজি একটা বাঁধ বানিয়ে দিয়েছে। মাইজির প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো পারেখের মুখে এক অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধার আবেগ লক্ষ্য করল অবনীশ দত্ত। বুড়ো বলে গেল, মাইজির ডাকে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ বিনে পয়সায় খুব উৎসাহ নিয়ে নিজেরাই ওই অমৃত্ গঙ্গার বাঁধ গড়েছে। বিঠলের লোকের জন্য ওই মাইজি আরো কত কি করেছে ঠিক নেই।···মাইজির কথা এখন দূরের গাঁয়ের লোকেরাও জানে, সুযোগ সুবিধে করতে পারলে তারাও এসে মাইজিকে দেখে যায়। পারেখেরও মাইজিকে একবার দেখার ইচ্ছে খুব, কিন্তু এতদিনেও তার সেই ভাগ্য হয়নি।

সবই ঘটনাচক্র বলা যেতে পারে। নইলে তামাম ভারতের কোথায় না ঘুরেছে অবনীশ দত্ত, গোড়ায় গোড়ায় মনেও হয়েছে কোথাও না কোথাও একদিন এক মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু এতদিনে সেই একজন স্মৃতি থেকেও প্রায় ঘষামোছা হয়ে গেছে। বুড়োর মুখে এতটা শোনার পরেও সেই স্মৃতি তরতাজা হয়ে ওঠেনি।

মাইজী বাঙালী শুনেই যা একটু আগ্রহ হয়েছিল অবনীশের। কোনো বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী হবেন ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ-রকম জায়গায় বাঙালী সন্ন্যাসিনীর অবস্থানের কথা বড় একটা শোনা যায় না। বলেছিল, চলো তাহলে বিঠল ঘুরে আসি আর মাইজিকেও দেখে আসি।

পারেখ খুশি। এদিকে তখন বিকেল গড়াতে চলেছে, ফিরতে

রাত হয়ে যাবে বেশ, কিন্তু আগ্রহের আতিশয্যে এই অসুবিধে নিয়ে আর কিছু উচ্চবাক্য করল না। সাহেবের মেজাজ জানা হয়ে গেছে তার, অসুবিধেয় পড়লেও অনুযোগ করার মানুষ নয়।

গাঁয়ের মাইল খানেক দূরে এসে সরকারী সড়ক শেষ। এখান থেকে মেটে কাঁচা রাস্তা শাল দেবদারুর বনের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে বিঠলে এসে শেষ হয়েছে।

নিজেই ড্রাইভ করছিল অবনীশ। জিপ আর এগোবে না। অতএব ওটা থামিয়ে ওই কাঁচা রাস্তার হাঁটা-পথ ধরল। দু'মাস আকাশের নীচে পড়ে থাকলেও ওই জিপের একটি কলকব্জাও খোয়া যাবে না। সেদিক থেকে নিরাপদ।

বিঠল গ্রামখানা ঘিরে উত্তর আর দক্ষিণে উঁচু-পাহাড় সমান্তরাল-ভাবে চলে গেছে যতদূর চোখ যায়। হিমালয়ের সঙ্গে এসব পাহাড়ের যোগ। আসল হিমালয়ও কাছে, মাইল তিরিশ-চল্লিশের মধ্যেই হবে।

গাঁয়ের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী অমৃত্ গঙ্গা। সরু খাড়াই নালা বললেই চলে। কিন্তু এক এক বর্ষায় এরই নাকি রুদ্রাণী সংহার মূর্তি। নদীর এখন হাঁটু জল হবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু প্রচণ্ড স্রোত। পাথরের ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে চলেছে। গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে অমৃত্ গঙ্গা পাহাড়ের গোলক ধাঁধায় অদৃশ্য। এখানকার মানুষদের ধারণা, বিঠল-বাসীদের দুর্দশা দেখে মা গঙ্গা নিজেই আবির্ভূতা হয়েছেন এখানে, এর জল পবিত্র অমৃতসমান—তাই অমৃত্ গঙ্গা। মনের আনন্দে জংলাপথ ভাঙতে ভাঙতে বুড়ো গাইড পারেখ এই সব সমাচার অবনীশকে জানালো। পরিবেশগুণে তারও শুনতে খারাপ লাগছিল না।

গ্রামখানা ছোট হলেও জনবসতি কম নয়। চাষ-আবাদের পাহাড়ী জমিও মন্দ নেই এখানে। লোকালয়ে এসে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াতে হল তাদের। বাইরের মানুষ দেখে অনেকে এগিয়ে আসছে। কালো কালো মেয়েরা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে

তাদের দেখতে লাগল। অবনীশের নিখুঁত সাহেবী বেশ-বাস। গায়ের রঙটাওত ফরসা। এই চেহারার আর পোশাকের মানুষদের এখানে বিরল পদক্ষেপ।

প্রকৃতি অনুযায়ী পুরুষদের চেহারাগুলো রুক্ষ মনে হল অবনীশের। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের চাউনি সরল হলেও তেমন প্রসন্ন নয়। বাইরের মানুষের পদক্ষেপ ওরা খুব একটা পছন্দ করে না মনে হল। বহু ঘোরার ফলে এই আদি মানুষদের রীতিনীতি মোটামুটি জানা আছে অবনীশের। কিছুকাল আগেও এদের বুকে হৃদয় নামে বস্তুটা তেমন সক্রিয় ছিল না। গ্রামের পুরুষেরা দল বেঁধে ভিন্ন গাঁয়ে ডাকাতি করেছে, সামান্য কারণে রক্তস্নান করেছে আর রক্তের বদলা নিয়েছে। তাই সভ্য দুনিয়ার মানুষেরা আগে ভালো রকম খোঁজ-খবর না নিয়ে হুট করে কোনো আদিবাসী অঞ্চলে পা ফেলত না।

দিন বদলেছে। সেদিক থেকে এখন ওরা অনেকটাই সভ্য হয়েছে বটে, কিন্তু ধমনীতে বংশগত রক্তের ধারা বইছে বলে অল্পতেই স্নায়ু তেতে ওঠে। বহিরাগতের পদার্পণ শুভ কি অশুভ সেই সংশয় ওদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে। এই গোছের নতুন জায়গায় এলে অবনীশ সাধারণত ওদের খুশি করার রসদ নিয়ে আসে। টিনের খাবার, সস্তা সিগারেট, শিশুদের খেলনাপাতি, মেয়েদের জন্য কিছু প্রসাধন-সামগ্রী ইত্যাদি। কিন্তু আজ সে বিনা প্রস্তুতিতে এসে হাজির হয়েছে। পকেটে দামী সিগারেট আছে প্যাকেট দুই। অগত্যা তাই একটা বার করে বুড়োদের দিকে এগিয়ে দিল।

অবশ্য এরও দরকার ছিল না। আদিবাসী গাইড পারেখ আছে তার সঙ্গে। তাছাড়া অকারণে হিংস্র নয় এ-তল্লাটের মানুষ সেটা তার জানাই ছিল। কাউকে একবার পছন্দ করলে বরং ছাড়তে চায় না সহজে। অবনীশের সে-রকম অভিজ্ঞতাও আছে।

হিন্দীই তাদের ভাষা, তবে সে-রকম পরিচ্ছন্ন হিন্দী নয়। পারেখ জানালো, সাহেব একজন মস্ত সাহেব—'বংগালী'—মাইজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আর তোমাদের গ্রাম দেখতে এসেছে।

বাঙালী শোনামাত্র ওদের চোখ মুখের ভাবই বদলে গেল। গম্ভীর মুখগুলো কোমল হল, চাউনিতে অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠল। ওদের মধ্যে সব থেকে বুড়ো লোকটা সবিনয়ে অবনীশের হাত থেকে সিগারেট নিল। তারপর আদর করে ডেকে তাঁকে সঙ্গে করে সামনের ডেরায় নিয়ে এলো। অবনীশও মোটামুটি হিন্দী বলতে কইতে পারে। বুড়োর কথা থেকে বোঝা গেল, সে মাইজিকে আগে খবর দিয়ে অনুমতি পেলে তারপর অতিথিদের তার কাছে নিয়ে যাবে। মাইজির সঙ্গে বাইরের মানুষের দেখা করার এটাই নিয়ম।

দূরের দিকে আঙুল তুলে দেখালো, ওই দিকের এক ডেরায় মাইজি থাকে।

উৎসাহের আতিশয্যে নিজেই চলল মাইজির কাছে। যেতে আসতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। এখনই সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রাতটা এখানে থেকে যাবারও আমন্ত্রণ বুড়ো জানিয়েই গেছে। সকাল না হলে গ্রাম দেখা যাবে না। শুধু বুড়োর নয়, সকলেরই চোখে মুখে ওই সাগ্রহ আপ্যায়ন লক্ষ্য করেছে অবনীশ। তাদের মাইজি বাঙালী, সেই কারণেই এই বাঙালী-প্রীতি সন্দেহ নেই। বাঙালী পরিচয়ের মহিমা যেন অনেক দিন অনুভব করল সে।

সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে আসছে। অবনীশ দত্তর থাকার ইচ্ছে নেই। বাঙালী মাইজির সঙ্গে দেখা করে চলেই যাবে। তাই এখানে অপেক্ষা না করে বুড়োর সঙ্গে যাবার কথাটা বলেছিল, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, মাইজির অনুমতি হলে তবে ভিতরে ঢুকবে।

কিন্তু বুড়ো রাজি না হতে অবাক একটু। লোকটা অল্প অল্প মাথা নেড়েছে, তারপর খুব নরম গলায় বলেছে, অনুমতি ভিন্ন বাইরের কাউকে মাইজির ডেরায় নিয়ে যাওয়াটাও নিয়মের বাইরে। সে চলে গেল। অগত্যা সন্ধ্যার আসন্ন ছায়ায় গাঁয়ের অন্য লোকদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে জায়গাটাই দেখতে লাগল অবনীশ।

ঘণ্টাখানেক বাদে বুড়ো যখন ফিরে এলো, তখন তার মুখের কোঁচকানো চামড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেন গম্ভীরগোছের বিস্ময় উঁকিঝুঁকি

দিচ্ছে। এখন আবার ওকে তেমন সদয় মনে হল না। জানালো, 'বংগালী' বাবুর সঙ্গে মাইজি দেখা করবে না, পারেখ ইচ্ছে করলে যেতে পারে—মাইজির সঙ্গে দেখা করতে পারে। স্পষ্টই বোঝা গেল এ-রকম একটা হুকুম আনার জন্য লোকটা নিজেও প্রস্তুত ছিল না।

অবনীশ দত্ত অবাক। এ-রকম অভ্যর্থনার জন্য কে আর প্রস্তুত থাকতে পারে? অবাক পারেখও। কোনো মহিয়সী মহিলা বাঙালী হয়ে বাঙালীর প্রতি অকরুণ কেন, কল্পনা করাও সহজ নয়। অবনীশের মনে হল তিনি অকরুণ বলেই হয়তো তাঁর এই ভক্তবৃন্দও আর তেমন সদয় নয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অবাক তারাও, কারণ, সাক্ষাৎকারের আবেদন নাকচ এই হয়তো প্রথম।

বেচারা পারেখ কি করবে ভেবে পেল না। বিমূঢ় মুখে সাহেবের দিকে চেয়ে রইল খানিক। উৎসাহ দিয়ে সে-ই এতটা পথ নিয়ে এসেছে এখন ইচ্ছে থাকলেও সাহেবকে ফেলে সে যায় কি করে। দায়ে পড়েই ও মাথা নাড়ল, সেও যাবে না তাহলে।

বুড়ো সর্দারের মুখখানা বিরস হয়ে উঠল তক্ষুনি, এই উক্তি ওদের মাইজির প্রতি অবজ্ঞার নামান্তর যেন। দলের লোকদের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বুড়ো নীরস হিন্দীতে জানালো, মাইজির যখন হুকুম হয়েছে তার যাওয়া উচিত, আর তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক প্রস্তুত।

অর্থাৎ না গেলে মাইজির অপমান, আর, সেটা এরা খুশি মনে বরদাস্ত করবে না। পারেখের যাওয়া-না-যাওয়া কার সম্মতি-নির্ভর লোকগুলো তাও বুঝেছে, তাই তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে ওরা। এ আবার কোন দেবী চৌধুরাণীর রাজত্বে এসে পড়ল ভেবে পাচ্ছে না অবনীশ। মাইজির এই আচরণের দরুন কৌতূহলও বেড়েছে। ইশারায় পারেখকে যেতে অনুমতি দিল। বলল, রাত হয়েছে, বেশি দেরি কোরো না, অনেকটা পথ, আমাদের আজই ফিরতে হবে।

পারেখ ফিরল প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে। খুশিতে ডগমগ মুখ। দেখেই বোঝা যায় মাইজির দেখা পেয়ে আনন্দ হয়েছে। নিজেকে

ভাগ্যবান ভাবছে সে। আবার তার সাহেবের সেই ভাগ্য হল না বলে কুণ্ঠিত একটু। ওর সঙ্গে কি কথা হয়েছে না হয়েছে সেটা চেপেই রাখল, বলল, মাইজি জানিয়েছে তার মনিব যেন রাগ না করেন, তিনি সামান্য মানুষ, গাঁয়ের সাধারণ লোক তাকে ভালোবাসে—কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করা বা কথা-বার্তা বলার কোনো যোগ্যতাই নেই। তার বাঙালীবাবুর নামও নাকি জিজ্ঞাসা করেছে মাইজি, পারেখ সেটা বলতে পারেনি, কারণ সাহেবকে শুধু সাহেব বলেই জানে সে।

বুড়ো সর্দারের মুখখানা এখন কিন্তু সদয় আবার। পারেখকে সঙ্গে করে সে-ই নিয়ে গেছল। সে জানালো, মাইজির হুকুম, এত রাতে জঙ্গলের পথে মেহ্‌মান আদমিদের যেন ছেড়ে না দেওয়া হয়। তাদের অভ্যর্থনার ভারও তার ওপরে।

মাইজির অনুরোধ নয়, হুকুম। অগত্যা সেই ব্যবস্থাতেই রাজী অবনীশ। মাইজির ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপত্তি করলেই হয়তো অপমান ভাববে অশিক্ষিত লোকগুলো।

পারেখকে একসময় ফাঁকায় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, মাইজিকে কেমন দেখলে বলো।

পারেখ উচ্ছ্বসিত একেবারে। তার অটুট বিশ্বাস দেহধারিণী কোনো দেবীই হবেন এখানকার মাইজি। এমন মিষ্টি হাসি আর এত মিষ্টি কথা ও আর দেখেনি বা শোনেনি। আর এত সুন্দর হিন্দী বলেন যেন ওটাই তার নিজের ভাষা। আবার বুড়ো সর্দারের মুখে পারেখ শুনেছে, সাদা চামড়ার পর্যটক মাঝেসাজে এখানে এসে পড়লে মাইজিকে নাকি ইংরেজিও চমৎকার বলতে শোনা গেছে তাদের সঙ্গে। এখানকার লোকদের ধারণা, মাইজি দেবীর অংশ, তাই দরকার মতো সমস্ত ভাষাই বলতে পারেন।

পারেখের সখেদ বিস্ময়, অমন করুণাময়ী মাইজি কেন নিজের দেশের লোক তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন না? এ-রকম নাকি কখনো হয় না, মাইজি কাউকে নিরাশ করেন না। তাই এখানকার

লোকগুলো সব আগে ধরে নিয়েছিল, বাঙালী সাহেব নিশ্চয় খারাপ লোক, মাইজি সেটা ধ্যানে বুঝতে পেরেছেন বলেই দেখা করেননি। বাঙালী সাহেবকে ভালো মতো সেবা-যত্ন করতে বলে ওদের এই ধারণা অবশ্য মাইজি ভেঙে দিয়েছেন। তাছাড়া দেখা করা সম্ভব হল না বলে মাইজিকে খুব দুঃখিতই দেখেছে তারা।

অবনীশ দত্ত মনে মনে যা ভেবে নিয়েছে সেটা আর ওকে বলা গেল না।...হয়তো বা কোনো বাঙালী মেয়ে অতি বড় আঘাত পেয়েই ঘর সংসার ছেড়ে এই পথে চলে এসেছেন, সেই আঘাত অথবা স্মৃতির দংশন এড়ানোর জন্যেই আর বাঙালীর সংস্পর্শে আসতে চান না। আর, তাই যদি হয়, এই সন্ন্যাসিনীর জীবনযাত্রায় তাঁর মধ্যে সেই ক্ষমা অথবা সেই প্রশান্তি এসেছে কিনা সন্দেহ। এ-রকম মনে হওয়ার ফলে অদেখা মহিলার প্রতি আগ্রহ বা কৌতূহল মিটে গেছে তার। ভোর হলেই রওনা হওয়ার কথা ভাবছে। মাইজির বয়স কতো হবে পারেখকে তাও জিজ্ঞাসা করতে ভুল হয়ে গেছে। তবু বৃদ্ধা বা অতিবৃদ্ধাই ধরে নিয়েছে।

ওধারে শুয়ে পারেখ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু অবনীশের ঘুম আসছিল না। বাইরে জ্যোৎস্নার যেন বন্যা নেমেছে। পাহাড়ের ওধারে থালার মতো মস্ত চাঁদটা জ্বলজ্বল করছে। অবনীশ বাইরের দাওয়ায় বসেছিল। পারেখের নাক ডাকার দাপটে ঘরে শুয়ে বসে থাকা যাচ্ছিল না। ঘড়ি দেখল, এগারোটাও বাজেনি রাত্রি। সমস্ত গ্রাম এরই মধ্যে ঘুমন্ত, নিঝুম। মনে হয় মাঝ রাত্রি।

বসে থাকতে ভালো লাগল না। দাওয়া ছেড়ে নেমে এলো। পায়ে পায়ে হাঁটা শুরু করল। কোনো কিছু লক্ষ্য করে নয়, এমনিই। জ্যোৎস্নার প্লাবনে পায়ের নীচের নুড়ি পাথরও দেখা যাচ্ছে। এই পরিবেশই তাকে অনির্দিষ্টের মতো টেনে নিয়ে চলল।

কতক্ষণ হেঁটেছে বা কতটা পথ গেছে খুব খেয়াল ছিল না। বেশ দূরে কোথা থেকে যেন মিষ্টি মিষ্টি ঘণ্টার শব্দ কানে আসছে। মন্দির-টন্দিরে যেমন বাজে, তেমনি। অবনীশ দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনল,

জ্যোৎস্নার সমুদ্রে চোখ চালিয়ে দেখতেও চেষ্টা করল। ঘণ্টার শব্দটুকু শুধু শোনা গেল, কিছু দেখা গেল না।

শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল আবার। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর অদূরে যেন ছোট মন্দিরের মতোই দেখা গেল একটা। খুব ভালো ঠাওর হচ্ছে না অবশ্য। সেখান থেকেই ঘণ্টার শব্দ আসছে আর ভিতরে প্রদীপের আলোও দেখা যাচ্ছে।

কৌতূহল বশে অবনীশ এগিয়েই চলল। ঘণ্টার মিষ্টি শব্দ আরো স্পষ্ট হল। হ্যাঁ মন্দিরেই বটে। পায়ে পায়ে একেবারে দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভিতরে আলো জ্বলছে বলেই ভিতরটা দেখাও যাচ্ছে। অবনীশ উঁকি দিয়ে দেখল রামজীর বিগ্রহ ভিতরে। বিগ্রহের সামনে একটি রমণী বসে। বিগ্রহের দিকে মুখ তার। এক-রাশ কালো চুল পিঠময় ছড়িয়ে কোমরের নীচে নেমে এসেছে।

তার হাত কয়েক তফাতে বসে একজন বয়স্ক আদিবাসী হাত-ঘণ্টা বাজাচ্ছে—আর তার পাশে দু'হাত জোড় করে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে বিকেলের সেই বৃদ্ধ সর্দার। ঢিমে তালে ঘণ্টা বাজছে, ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতি যেন এটুকুর মধ্যে নিশ্চল হয়ে আছে একেবারে।

স্তব্ধ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে অবনীশ। না, তখনো তার মনে কোনো স্মৃতির আঁচড় পড়েনি, শুধু চোখের সামনে যেটুকু দেখছে তাইতেই বিভোর সে।...এই কি এদের মাইজি নাকি! আশ্চর্য! বয়েস কত হবে রমণীর? মুখ দেখা যাচ্ছে না, অথচ যতটুকু ঠাওর করা যাচ্ছে মনে হচ্ছে বাইশ-চব্বিশের বেশি হবে না।

—কওন্! কওন্?

হঠাৎ পিছনে গম্ভীর বাঁজখাই গলা শুনে বিষম চমকে উঠল অবনীশ। পাশে, হাতের প্রায় নাগালের মধ্যে আদুড় গায়ে নিকষ কালো একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে। চোখ-জোড়া কঠিন, অন্ধকারেও দু'চোখ জ্বলছে তার। অবনীশ ঘুরে দাঁড়াতেই লোকটা তাকে চিনেছে বোধহয়, কারণ চাউনিটা আরো তীক্ষ্ণ অকরুণ হয়ে উঠল।

ও-দিকে গলা শুনে মন্দিরের লোক দুটোও বেরিয়ে এসেছে। বুড়ো সর্দার এক লাফে সামনে এসে খপ করে বজ্রমুষ্টিতে অবনীশের একখানা হাত ধরে ফেলল। হিংস্র চাপা গলায় কৈফিয়ত তলব করল, তুম ইধর কাঁহে আয়া?

অপরাধটা একমুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিয়েছে অবনীশ। ওদের যা সন্দেহ সেটা অস্বাভাবিক নয় একটুও। কোনো মতলব ভিন্ন বাইরের মানুষ অপরিচিত জায়গায় এ-সময় হাওয়া খেতে বেরোয় না। এই লোকগুলো ধরে নিয়েছে মা যার সঙ্গে দেখা করেননি সে-ই লোক সাক্ষাতের অভিসন্ধি নিয়েই রাতের এই অসময়ে মন্দিরে এসে হাজির হয়েছে।

জবাব না দিয়ে অবনীশ অসহায় মুখে মন্দিরের দিকেই ঘুরে তাকালো। বাইরের এই চাপা উত্তেজনা তাঁরও কানে গেছে। ওদের মাইজি এদিকেই আসছেন—এখনো অল্প বয়সীই লাগছে তাঁকে। তিনি সদয়া হলেই ত্রাণের আশা।

কিন্তু পরমুহূর্তে যেন প্রচণ্ড একটা শক খেয়ে স্থান-কাল বিস্মৃতের মতোই নির্বোধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল অবনীশ। এ কি দেখছে, কাকে দেখছে সে? হুবহু এ কার মুখের আদল? সত্যি দেখছে না ঘুমের ঘোরে কোনো বাঞ্ছিত সম্ভাবনা বিস্মৃতির পরদা ঠেলে তার সামনে উপস্থিত এখন? কে এগিয়ে আসছে তার দিকে? নিজের এই দুটো চোখকে কি সে বিশ্বাস করবে?

রমণী সিঁড়ি ধরে শান্ত পদক্ষেপে নেমে আসছে, তার এক হাতে লণ্ঠন। লণ্ঠনের আলোয় কালো মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অবনীশ। কালো কিন্তু বড় সুন্দর আর কমনীয়—অনেক অনেক দিনের হারানো মুখ একখানা।...রমণীর পরনে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি, গায়ে জামা নেই, শাড়ির আঁচল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। নিটোল যৌবনসম্ভার অস্পষ্ট নয় একটুও, কিন্তু সেদিকে চোখ দেবার মানুষ এ-স্থানে নেই বলেই হয়তো নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ।

নেমে সামনে এসে দাঁড়ালো। অবনীশ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বলে

তার মুখ রমণীর অগোচর তখনো। লণ্ঠনটা একটু উঁচু করে তুলে মুখ দেখল। যে বিস্ময়ের ধাক্কায় অবনীশ নির্বাক বিমূঢ়, চকিতে রমণীর চোখে মুখে সেই গোছেরই নীরব বিপর্যয় কয়েক মুহূর্তের জন্য। তফাত এই যে, রমণীর সেটুকু সামলে নিতে সময় লাগল না। পরক্ষণেই ঠাণ্ডা কমনীয় মূর্তি। আত্মসংযমের উপর তার স্থির অধিকার।

হুকুমের প্রত্যাশায় বুড়ো সর্দার তাদের মাইজির দিকে তাকালো। নির্দেশ পেলেই অনায়াসে সে এই ধৃষ্টতা আর অবাধ্যতার নির্মম ফয়েসলা করে ফেলতে পারে। নির্বাক অপরাধীর একহাত তখনো তার শক্ত মুঠিতে ধরা।

—ছোড় দো।···কওন্ আয়ে মুঝে মালুম নহী থী···ইয়ে মেরী ভাই—।

রাত দুপুরে এমন নাটকীয় কাণ্ডর জন্য কে আর প্রস্তুত থাকতে পারে। ওরা বিমূঢ় খানিক। তারপর বুড়ো শশব্যস্তে হাত ছেড়ে দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে বাকি লোক দুটোও। যেন ওরাই মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে কিছু।

কিন্তু অবনীশের ওদের দিকে চোখ নেই আর। বিস্ফারিত নেত্রে রমণীকে দেখছে। তার গলা দিয়ে এতক্ষণের অবরুদ্ধ বিস্ময়টা আপনিই বেরিয়ে এলো। —রমা তুমি! তুমি এখানে!

দু'চোখ তুলে রমণী সোজা তাকালো অবনীশের দিকে। অদ্ভুত সংযত অথচ মিষ্টি চাউনি। চকিতে একটু কৌতুকও উঁকিঝুঁকি দিল কিনা বোঝা গেল না। এই চাউনি, প্রচ্ছন্ন এই কৌতুকাভাসের রীতিও তার বড় চেনা। তবু এ যেন সম্পূর্ণ আর কেউ।

তেমনি ঠাণ্ডা আর মিষ্টি গলার স্বর।—আপনি এসেছেন ভাবতে পারিনি, অপরাধ নেবেন না।

অবনীশের বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখনো। স্নায়ুগুলো কাঁপছে। বাঙালীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি কেন, একথার পরেও সে চিন্তা মাথায় আসেনি। মুখে কথা সরল না, চেয়েই রইল শুধু। অন্য

তিনটে লোকও নিরীক্ষণ করে দেখছে, ভাইবোনের একটা নাটকীয় সাক্ষাৎকার বিস্ময়ের খোরাক হয়েছে ওদের।

—আসুন।

শান্ত মিষ্টি আহ্বান। লণ্ঠনটা বুড়ো সর্দারের দিকে বাড়িয়ে দিতে সে সেটা হাতে নিয়ে দু'পা আগে আগে চলল। নিজের বেশবাস সম্পর্কে সচেতন হয়েছে বলেই মহিলা লণ্ঠন হাতছাড়া করল কিনা জানে না। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই অবনীশ দত্ত যেন মাতৃত্বের এক আশ্চর্য সুষমা দেখেছে শুধু। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। পুরুষের মুখ। সেই মুহূর্তে মনে হল, ওই পুরুষ এই পরিবেশে ঠিক এই মূর্তিতে একে এখানে দেখলে সে কেমন-ধারা বিস্ময়ের ধাক্কা খেত? অন্ধকার ফুঁড়ে রমণীর মুখ দেখতে চেষ্টা করল। দেখা গেল না। বাকি দুটো লোক একটু পিছনে আসছে—মাঝে তারা দু'জন পাশাপাশি।

পথে আর একটি কথাও হল না। মহিলার মনের কথা বলতে পারে না, কিন্তু অবনীশের ভিতরে ভিতরে এক বিচিত্র আলোড়ন শুরু হয়েছে। এত বড় বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিল এখানে, এ কে কল্পনা করতে পারে?

মিনিট সাত আট বাদে একটা খোড়ো কুটীরের সামনে এলো সকলে।...দুটো মাটির সিঁড়ি, তারপর মাটির দাওয়া, তারপর চিলতে-বাঁশ আর বেতের দরজা। অবনীশ আগেও লক্ষ্য করেছে এখানকার সব ডেরাই মোটামুটি এই ধাঁচের।...সামনের দরজাটা খোলা—ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে টিমটিম করে। প্রথমে রমণী এবং পরে একে একে ওই সকলে দাওয়ায় ওঠার পর ওই বিচিত্ররূপিণী হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা সর্দারের হাত থেকে নিল। অস্ফুটস্বরে অবনীশকে বলল, দাঁড়ান একটু।

এমন কিছুই ঘটেনি যেন, ঠাণ্ডা মুখে লণ্ঠন হাতে কুঁড়ের ভিতরে ঢুকে দরজাটা টেনে দিল। মিনিট আট দশের মধ্যেই আবার দরজা খুলে অবনীশকে ডাকল, আসুন—।

অবনীশ দেখল এরই মধ্যে বেশবাস বদলে নিয়েছে। পরনে আটপৌরে লাল পেড়ে শাড়ি, গায়ে লম্বা শেমিজ। এই বেশে শুধুই মাতৃত্বটুকু চোখে পড়ে, আর কিছু না। স্থানীয় ওই লোক তিনজনের উদ্দেশে স্পষ্ট সুন্দর হিন্দীতে বলল, তোমরা খেয়ে এসো, তোমাদের অতিথি কিছুক্ষণ এখানে থাকবেন, তোমরা এসে আবার এঁকে তার ডেরায় পৌঁছে দেবে।

ঘাড় নেড়ে প্রস্থান করল তারা। এই রকমই বোধ হয় তাদের মাইজির হুকুমের সুর। অবনীশ ভিতরে ঢুকল।···তখনই মনে পড়ল, রমা···রমা নয়, কোনো একদিনের মালবী মিত্রর মুখে কোন্ একটা ছবিতে অনর্গল হিন্দী কথাও শুনেছিল বটে। আর তার পরস্ত্রীর মুখে জেনেছিল, মোটা মাইনের অবাঙালী মাস্টার রেখে চোস্ত হিন্দী শিখেছে তার বান্ধবী।

ঘরটা বেশ বড় আর পরিচ্ছন্ন। নিয়মিত প্রলেপে মাটির দেয়াল আর ঘরের মেঝে তকতক করছে। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। এক কোণে দড়ির চারপেয়ে, তার ওপর অতি সরল শয্যা বিছানো। মোটা কম্বলের ওপর একটা মোটা চাদর বিছানো। অন্য কোণে সামান্য রান্নার সরঞ্জাম, পাথরের থালা আর গেলাস ইত্যাদি। সেখানে কিছু ফলমূলও আছে। আর একদিকে সামান্য পূজার উপকরণ, সামনে রামজীর মূর্তি, চারপেয়ের নীচে গোটা দুই ট্রাংক!

মেঝেতে একটা বড় আসন পেতে দিয়ে মহিলা মিষ্টি হেসে বলল, খুব ধকল গেছে আপনার, বসুন।

হাত কয়েক তফাতে নিজেও মেঝের ওপরই বসে পড়ল। আবার অল্প হেসে বলল, কতকাল বাদে যে বাংলা কথা বললাম কে জানে··· বছর সাতেক হবে, না?

অবনীশ জবাব দিল না, নির্নিমেষে চেয়েই আছে।···সেই মেয়েই বটে···কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ আর একজন। বড় বিস্ময়কর আর একজন।···বয়েস কত হবে এখন? ঠিক সুমিতার বয়সি, কম করে সাঁইতিরিশ তাহলে। শেষ যখন দেখেছে বছর উনতিরিশ-তিরিশের

হবে। বয়েসটা জানত বলেই, কিন্তু তখনো চোখে অত লাগত না। আশ্চর্য, এত বছর বাদে বয়েসটা যেন তার থেকেও কম দেখাচ্ছে। খুব বেশি হলে ছাব্বিশ সাতাশ মনে হয়। পাহাড় আর জঙ্গলের একটা কাঁচা কমনীয় পেলবতায় কালো মুখের শ্রী যেন উপচে পড়ছে। কৃচ্ছ্র-সাধনে সমস্ত বাড়তি বাহুল্য ঘুচে গিয়ে ওই রমণী দেহে যৌবন যেমন আপন মহিমায় স্থির হয়ে আছে।

—কি দেখছেন? সহজ নিঃসঙ্কোচ প্রশ্ন। এই রাতে এমন এক পরিবেশে একজন পুরুষ তার সামনে বসে সেই চেতনার কোনো ঠাঁই মনের কোণেও নেই যেন। ওদের যা-ই বলুক, সত্যিই এই মেয়ের ভাই নয় সে। এতটা নিঃসঙ্কোচ বা সহজ হবার মতো আত্মীয়ও নয়।

—রমা সত্যিই তুমি! অবনীশের গলায় নিখাদ বিস্ময় ঝরল, এ-যে এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না!

—মালবী মিত্র বলে মনে হচ্ছে? তেমনি সহজ স্বচ্ছ কৌতুকঝরা প্রশ্ন।

অবনীশ চেয়ে রইল খানিক, তারপর মাথা নাড়ল, বলল, কে যে, আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

অস্ফুট একটু শব্দ করে হেসে উঠল। —ভেবে পাবেন কি করে, রমা মিত্রও নেই মালবী মিত্রও নেই—ও দুটোই মরেছে।

—মরে গিয়ে কে এসেছে, মাইজি?

হাসি মুখে মাথা ঝাঁকালো। হ্যাঁ অবনীশবাবু, এখানে আমার কত যে ছেলেমেয়ে জানেন না তো!

এই মুখ দেখলে হঠাৎ মনে হবে এই মেয়ে—যে মেয়ে একদিন ছিল রমা আর একদিন মালবী মিত্র, সে যেন অনেক খুইয়েও তার জীবনের এক পরম শান্ত পরিতৃপ্তির মোহনায় এসে পৌঁছেছে। সত্যিকারের কোনো মা-কেই দেখছে কিনা অবনীশ দত্ত জানে না। অবশ্য কৌতুক-ঝরা হাসিটুকু দেখে মনের তলায় সংশয়, এই মুহূর্তে ও হয়তো মালবী মিত্র হয়ে উঠেছে—যার শুধু বাইরেটাই চেনা যেতে পারে, ভিতরটা নয়। কখনো কেউ চেনেনি।

এতক্ষণ একটা জিনিস লক্ষ্য করেনি অবনীশ। এখন চোখে পড়ল। সীঁথির মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম একটু সিঁদুরের আঁচড়। চোখ দুটো করকর করে উঠল কেমন। চকিতে একটা সন্দেহ মনের তলায় চিকিয়ে গেল। কিন্তু না, আবার কোনো পুরুষ এই মেয়ের জীবনে এসেছে বিশ্বাস করে না! আত্মরক্ষার কারণে হোক বা যে কারণে হোক ওই সিঁদুর চিহ্নের হয়তো প্রয়োজন হয়েছে! হয়তো বা বহু ছেলেমেয়ের মা এখন, সেই কারণেই এটুকু সীমন্তে স্থান পেয়েছে। ...কিন্তু সিঁদুর নিয়ে কোনো মেয়ে খেলা করতে পারে? খেলা না হোক, কেউ এর আড়ালে গোপনতার আশ্রয় নিতে পারে? আর কেউ না হোক, এই রমা মিত্র পারে নিছক ছলনায় আশ্রয় নিতে? অবনীশের মন বলে পারে না। দু'চোখ ভরে শুধু দেখার মতোই বটে এই মুখখানা।

...আর একদিনের ঘটনা মনে পড়ল। তখন রমা মিত্রর অস্তিত্ব ঘুচে গেছে। কতটা ঘুচে গেছে সেটা অবনীশ আর সুমিতা সামনা-সামনি তাকে না দেখেও অনুভব করতে পারত। কারণ, সেই জায়গায় বহুজনবন্দিতা মালবী মিত্রর জোরালো অভ্যুদয় ঘটেছে। একটা ইংরেজি সিনেমা হল থেকে বেরুবার মুখে সুমিতা আর অবনীশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। রমা মিত্র মালবী মিত্র হবার পর ওই একদিনই মুখোমুখি দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে।

...মালবী মিত্র থতমত খেয়ে গেছল একটু। কারণ, রমা মিত্রর অস্তিত্ব জানত বা জানে এমন সকলকেই সে পরিহার করে চলছিল। কিন্তু আগে যা পারত না তখন তা সহজেই পারে। কিন্তু বিস্ময়ের সুচারুবিন্যাসে ভিতরের বিড়ম্বনাটুকু মুছে ফেলতে সময় লাগেনি একটুও! দু'চোখ কপালে তুলে বলেছিল, সুমি তুই! অ্যাঁ! ঠিক দেখছি তো? ...অবনীশও যে, ওঃ, কতদিন পরে দেখা, কেমন আছ দুটিতে?

অবনীশদা নয়, অবনীশবাবু নয়—শুধু অবনীশ। এ-রকম আপ্যায়নের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। অবনীশ নিজেই অস্বস্তি

বোধ করেছিল কেমন। এক মুহূর্তের আচরণে সেই মালবী মিত্র তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল রমা মিত্র মরে গেছে। সঙ্গে একজন শৌখিন সুপুরুষ ভদ্রলোক। তার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর ঠিকানা দেওয়া নেওয়া করেছিল। ওদের যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, আর সেও একদিন আসবে কথা দিয়েছিল।

কিন্তু সেদিনের মালবী মিত্র জানত, সেও যাবে না ওরাও আসবে না। রমা মিত্র নেই, সে কার কাছে যাবে, ওরাই বা কার কাছে আসবে। এই পাহাড়ী গাঁয়ে সেই মেয়ের সঙ্গে আজ বিচিত্র যোগাযোগ। ...কিন্তু আজ 'অবনীশবাবু' আর আপনি করে কথা বলছে। ...সেদিন যেমন কানের পর্দা আহত হবার উপক্রম হয়েছিল, আজ গলার আওয়াজটুকু শুনেও দু'কান যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

—সুমিতা কেমন আছে?

—ভালো।

—ছেলেপুলে কি?

অবনীশ হাসল একটু, হাল্‌কা করে জবাব দিল, তোমার মতো এত নয়, এক ছেলে এক মেয়ে।

—বাঃ। সুমিতা আমাকে ভুলে গেছে নিশ্চয়?

অবনীশ এবারে গম্ভীর একটু। —চেষ্টা করেছে, পেরেছে কিনা ঠিক বলতে পারব না।

রমা মিত্র চেয়ে রইল একটু। কিন্তু এ চাউনির মধ্যে কোনো খেদ বা ক্ষোভ নেই। শান্ত, স্নিগ্ধ। —আপনি এদিকে কেন এসেছিলেন?

—কাজে। কি কাজ আর কোথায় কাজ তাও বলল।

ও বলল, ভাগ্যিস এসেছিলেন তাই দেখাটা হয়ে গেল।

জবাব দিল, ভাগ্যটা আমারই, বাঙালীবাবু শুনে তুমি দেখা না করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলে।

সত্যিকারের লজ্জায় কমনীয় দেখালো মুখখানা। —আমি কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি, আপনি—

অন্য বাঙালী হলেই বা দেখা করবে না কেন সে কথা মুখ ফুটে অবনীশ জিজ্ঞাসা করেনি। সেটা সহজে অনুমানসাপেক্ষ। বাঙালীর চোখে দীর্ঘ সাত আট বছর ধরে সে অনুপস্থিত বটে, কিন্তু বাঙালীর স্মৃতিপট থেকে মালবী মিত্র তখনো মুছে নাও গিয়ে থাকতে পারে। না, এরই মধ্যে মুছে যাওয়া সম্ভবও নয়। বাংলা ছায়া-ছবির জগৎ থেকে অকস্মাৎ মালবী মিত্রর হারিয়ে যাওয়াটা এক বড় গোছের শিল্পগতলোকসান।···সেই মালবী মিত্রর পুরনো ছবি এখনো বেশ কয়েকখানা চালু আছে।

তাই বাঙালীকে পরিহার করে চলা তার প্রয়োজন।

হঠাৎ একসময় কথা যেন ফুরিয়ে এলো। দু'জনেই চুপচাপ খানিক। অবনীশ লক্ষ্য করছে। এবারে একজনের কথা ওঠার কথা। ওঠা স্বাভাবিক। যে একজন বিগত সাত আট বছরে নিজের তাজা প্রাণের অনেকখানি ক্ষয় করে ফেলেছে, অনেকখানি অপচয় করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে বা কিভাবে জীবনের মাশুল গুণে চলেছে, অবনীশ জানে না। কিন্তু এই স্বল্প নীরবতার ফাঁক ধরে তার একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব যেন দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তারই প্রসঙ্গ ওঠা স্বাভাবিক এখন। নীরবতা দিয়ে রমা মিত্র যেন সেই সম্ভাবনাটুকুই ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু ঠেলে সরানোর ইচ্ছে অবনীশের আদৌ নেই। আজ আট বছর ধরে তিলে তিলে যে মানুষ জ্বলছে আর জ্বলছে, জ্বলে জ্বলে নিজের জীবনের সমস্ত উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি সংহার করেছে, আর সেই সঙ্গে আর একটা মেয়ের জীবনও পুড়িয়ে দিয়েছে—এই একজনের কাছে তার অন্তত কিছু জবাবদিহি প্রাপ্য। তার হয়ে অবনীশ দত্ত সেটুকু বুঝে নিতেই চেষ্টা করবে। মুখের ওপর চোখ রেখেই জিজ্ঞাসা করল, আর কারো কথা জানতে চাও না?

অপলক চোখে চুপচাপ চেয়েই রইল একটু। একটা উদগত অনুভূতি চাপতে চেষ্টা করছে বোঝা গেল শুধু, কিন্তু তেমন কোনো যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়ে উঠল না। সাত আট বছর ধরে এই সংযমেই হয়তো

অভ্যস্ত করেছে নিজেকে। মিষ্টি করেই জবাব দিল, কে জানতে চাইবে বলুন, আমি এখানকার সক্কলের মা! এই একটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রসঙ্গর এখানেই শেষ যেন। বেশ সহজ সুরেই বলল, ···অনেক রাত হয়ে গেল, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, মংলু এখনো তো এলো না দেখছি···আমি এগিয়ে দেব?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হেসেই ফেলল একটু। অবনীশ চেয়ে আছে। দেখছে। সত্যিই এতটা নিস্পৃহ হতে পেরেছে কিনা বুঝে উঠছে না। মুখ দেখলে মনে হয় পেরেছে। তার বেশি আর কেমন করে দেখবে? কিন্তু অবনীশের দেখার ইচ্ছে। বোঝার ইচ্ছে। নিজের অগোচরে সেই ইচ্ছেটা অকরুণ হয়ে উঠছে। তা না হলেই যেন আর একজনের প্রতি অবিচার করা হবে।

—আমি যাবার জন্য ব্যস্ত নই একটুও। নড়েচড়ে সোজা হয়ে অর্থাৎ প্রস্তুত হয়ে বসল একটু। কিন্তু আর কিছু বলার আগে ঘরের কোণের ফলমূলের দিকে চোখ যেতে কি মনে পড়ল। ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, মন্দির থেকে তো পুজো সেরে এলে, তোমার খাওয়া-দাওয়া?

এক্ষুনি ওঠার ইচ্ছে নেই রমা মিত্র বুঝেছে। হাসিমুখেই জবাব দিল, হবে'খন, আমার এমন কিছু দেরি হয়নি।

—কি খাবে, ওই ফলমূল?

—কি কাণ্ড, মেয়েদের খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করে। প্রসঙ্গ বদল হতে সে যেন ভিতরে ভিতরে স্বস্তি বোধ করল একটু। হাল্‌কা সুরে বলল, ফল আছে, দুধ আছে, কত কি খাই, কত বছর বাদে তো দেখছেন, শরীর আমার একটুও খারাপ হয়েছে?

বলতে বলতে সহজ হাসিমুখে দুই বাহু সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ, দেখুন খারাপ হয়েছে কি না।

অবনীশের দুই চোখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গের এমন দৃপ্ত ঋজু কমনীয়তা খেয়ে হয় কি মিতাহারের কৃচ্ছ্রসাধনায় হয়, সে জানে না। হেসে জবাব দিল, তা যদি বলো তো বয়েসটা তোমার সেই পঁচিশ·

ছাব্বিশের থেকে এক পাও নড়েনি—আর পঁচিশ ছাব্বিশেও এত ভালো ছিল না হয়তো। মন্দিরে যখন ওদিক ফিরে বসেছিলে আমি তো একটা কচি মেয়ে ভেবেছিলাম।...তা এটা কি তোমার ওই গাছের ফলের গুণ না আর কিছুর?

লজ্জা পেয়ে শাড়ির আঁচল আর একটু টেনেটুনে মুড়ি দিয়ে বলল, কি যে বলেন, বুড়ী হয়ে গেলাম—

—মাইজি!

বাইরে থেকে বুড়ো সর্দারের গলার আওয়াজ এলো।

—মংলু এলি? মিষ্টি হিন্দীতে এধারে মা-ই সাড়া দিল যেন, দাঁড়া বাবা একটু, ভাইয়া এক্ষুনি যাবেন। আর অবস্থানের ইচ্ছেটা এই এককথায় সোজাসুজি বাতিল করে দিল সে। মংলুর প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন। অবনীশের দিকে ফিরল, যান, আজকের মতো গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন...আপনার কষ্ট হবে হয়তো, কি-রকম ব্যবস্থা করেছে ওরা কে জানে।

এই মিষ্টি বিদায়ে অবনীশের খুশি হবার কথা নয় একটুও। হলও না। গাত্রোত্থান করতে হল। প্রচ্ছন্ন টিপ্পনীর সুরে জবাব দিল, মাইজির হুকুমে বেশ ভালো ব্যবস্থাই করেছে।

—করে থাকলেই ভালো। তার অখুশি মুখ রমা মিত্রের চোখেও পড়ল না যেন। সেও উঠে দাঁড়াল, কাল কথা হবে তাহলে—

মুখ তুলে অবনীশ সোজা তাকালো তার দিকে, কিন্তু কাল সকালেই তো আমি চলে যাচ্ছি!

মিষ্টি করে হাসল।—কাল যাচ্ছেন কি পরশু যাচ্ছেন কি কবে যাচ্ছেন আপনি জানলেন কি করে? ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস চোখে পড়ে কি পড়ে না। খুব আলতো- করে অতি সহজে নিজের জোরটাই যেন বুঝিয়ে দিল সে। বলল, এখানে নিজের ইচ্ছেয় আসা যায়, যাওয়াটা সব সময় নিজের ইচ্ছেয় হয় না—মাইজির অনিচ্ছা শুনলে ওই মংলু আপনাকে তিন মাসও আটকে রেখে দিতে পারে।

এও শুনতে ভালো লাগল। এই বেশবাস না দেখলে বা এই খোড়ো ঘরের পরিবেশের বাস্তবটুকু ভুলতে পারলে রমা মিত্র বা মালবী মিত্রর থেকে মাইজিটি কত তফাতে দাঁড়িয়ে সেটা ঠাওর করা শক্ত হত। অবনীশও তেমনি হাল্‌কা করেই জবাব দিল, মাইজির এ-রকম অনিচ্ছার নজির ওরা সত্যিই কখনো দেখেছে কি ?

—তা অবশ্য দেখেনি। হাসছে অল্প অল্প।—কিন্তু তাহলেও কাল সত্যি আপনি যাচ্ছেন না।

বাইরে লোকটা অপেক্ষা করছে। তবু পা বাড়ানোর আগে একটা যাচাইয়ের ইচ্ছে যেন নির্মমভাবেই অবনীশকে পেয়ে বসল। বলল, আপত্তি নেই, কিন্তু এই বিঠল ছেড়ে চলে যাবার পরেও কি আমার ওপর মাইজির কোনো নির্দেশ থাকবে, আর থাকলেও সেটা টিকবে বলে তিনি আশা করেন ?

দেখা যখন হয়েছে, আজ হোক কাল হোক এই প্রশ্নের মুখোমুখি অবনীশ টেনে আনতই তাকে। কিন্তু কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরে মন হল আজ অন্তত এ কথা না তুললেই ভালো হত। রমা মিত্র চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর শান্ত সুরে জবাব দিল, আশা করি।···কারো শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনে।

জবাবটা শোনামাত্র অবনীশের মেজাজ আরো বেশি বিগড়ে গেল। কিন্তু কথার সুরে বা আচরণে সেটুকু প্রকাশ করতে রাজি নয়। সেও খানিক তেমনি চেয়ে থেকে বলল, তুমি শান্তিতে আছ সেটা সুখের কথা···আর একজনের সুখশান্তির প্রশ্ন চিরদিনের মতোই চুকেবুকে গেছে। যাক, চলি—

—কি বললেন ? কি বললেন আপনি ?

মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ পাণ্ডুর সমস্ত মুখ। একটা অজানা আশংকার অস্থিরতায় উন্মুখ ডাগর চোখের খরদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। যেন কি বলল সেটুকু বুঝে নেবার মধ্যেই তার এই অস্তিত্বের অনেকখানি নির্ভর করছে।

যাচাই হয়ে গেছে। অবনীশ খুশি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অপ্রস্তুত একটু। বলল, না তুমি যা ভাবছ তা নয়···কিন্তু জীবনে বেঁচে থাকাটাই তো সুখ-শান্তির সব বা শেষ নয়···কারো কারো কাছে সেও অভিশাপের মতোই হতে পারে, তুমি কারো সুখ-শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে চাও না সেটুকু তোমার তৃপ্তি। তোমার চাওয়া না চাওয়া নিয়ে জগতের আর কতটুকু চলছে বলো।···যাক গে, তুমি তো কিছু শুনতেই চাও না।

একটা বড় সংকট কাটল বটে, কিন্তু তলায় তলায় এক অজানা আশংকা থিতিয়েই থাকল। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আর একটা কথাও তুলল না। তেমনি মুখের দিকে চেয়ে আছে চুপচাপ। শান্ত মুখে বেদনার ছায়া।

অবনীশের আবারও মনে হল, আশ্চর্য সংযম বটে এই মেয়ের। দরজার দিকে এগিয়েও আর একবার থামল সে। জিজ্ঞেস করল, কাল আমি সত্যিই যাচ্ছি না তাহলে?

জবাব দিল না। চেয়ে আছে। সামান্য মাথা নাড়ল। না।

পরের সমস্ত দিন আর রাতের মধ্যে রমা মিত্রর দেখাই মিলল না। অথচ অবনীশের আদর-আপ্যায়ন বেড়ে গেছে। তার খাওয়া শোয়া বিশ্রামের প্রতি মংলু আর তার সহচরদের বিশেষ নজর থেকে বোঝা গেছে এর পিছনে কারো বিশেষ নির্দেশ আছে। ওদের কাছে ভাই পরিচয় দিয়েছে নিজের, অথচ সকাল দুপুর পেরিয়ে বিকেল গড়ালো অথচ সেই ভাইকে একবার ডেকে পাঠালো না দেখে এই লোকগুলোরও অবাক হবার কথা। কিন্তু না, ওরা অবাক হয়নি। না হওয়ার কারণটা সন্ধ্যার দিকে বোঝা গেল।

অবনীশ যতবার খোঁজ নিয়েছে, মংলু সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছে ওদের মাইজি আজ ব্যস্ত খুব।

…কি জন্যে ব্যস্ত বলো তো? কৌতূহল দমন করতে না পেরে সন্ধ্যার মুখে অবনীশ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিল। মংলু জানিয়েছে ওদের মাইজি আজ কি একটা বিশেষ ব্রত পালন করছে। সকাল থেকেই রামজীর মন্দিরে কাটাচ্ছে। আরো শুনল, মাইজি হঠাৎ-হঠাৎ এ-রকম করে থাকে—খুব কম অবশ্য—কিন্তু তখন সমস্ত দিনরাতের মধ্যে জলটুকুও খায় না, কারো সঙ্গে কথা বলে না, চব্বিশ ঘণ্টা মন্দিরেই পড়ে থাকে।

তার পাশে দাঁড়িয়ে বুড়ো গাইড পারেখ মংলুর কথাগুলো গিলছিল। সশ্রদ্ধ ভক্তির আতিশয্যে সে দু'হাত তুলে কপালে ঠেকালো। তার সাহেব ওই মাইজির ভাই শোনার পর থেকে বিস্ময়ে আর আনন্দে ও সর্বক্ষণ হাওয়ায় ভাসছে। খবরটা পেয়ে মনে মনে প্রথমে বিরক্তি বোধ করেছিল অবনীশ। তাকে আটকে রেখে এ আবার কি-রকম ব্রত পালন! চলে গেলে কি হয় এ-ও ভেবেছে। কিন্তু যাওয়াটা সহজ নয় তাও অনুভব করেছে।

বিরক্তি গিয়ে এর পরে অন্য চিন্তা মাথায় এসেছে।…ওদের মাইজির এই ব্রত অনুষ্ঠান হঠাৎ-ব্যাপার কিছু। কাল রাতে পর্যন্ত কোনো-রকম ব্রত-কল্পনা মহিলার মাথায় ছিল না, অবনীশ সে-সম্পর্কে নিঃসংশয়। আজ আর তার দেখা মিলবে না এটা তাহলে গত রাতেই বলে দিত। তাছাড়া আজকের ব্রত অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা মংলুদেরও জানা ছিল না বোঝা গেল। সে বলেছে, মাইজি হঠাৎ-হঠাৎ এ-রকম করে থাকে, আর সেও খুব কম।…এই কৃচ্ছ্রসাধন তাহলে হঠাৎ কারো কল্যাণ কামনার জন্য হতে পারে, আবার নিজেকে স্থির সংযত রাখার আত্মপ্রস্তুতির দরুণও হতে পারে। একজনের সব সুখ-শান্তির প্রশ্ন চিরদিনের মতো চুকে গেছে শোনা-মাত্র যে আর্ত মুখ দেখেছিল গত রাত্রে সেটা ভোলবার নয়।

হঠাৎ এই ব্রতর তাৎপর্য অবনীশের কাছে অস্পষ্ট থাকল না। তা সত্ত্বেও থেকে থেকে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল।

এই দিনটা কাটল একরকম করে।

পরদিন সকালের দিকে মংলু এসে খবর দিল, মাইজি ঘরে আছে এবং তাকে ডাকছে। এইটুকুরই প্রতীক্ষা। পরনের বেশ-বাস লক্ষ্য করারও ফুরসত নেই যেন। তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল। কোনো রমণীর সাক্ষাৎলাভের জন্য অবনীশ ভিতরে ভিতরে এতখানি উন্মুখ আর কখনো হয়েছে কিনা জানে না।

দূর থেকে তাকে দেখামাত্র একটা অ-মলিন ভালোলাগার অনুভূতি যেন ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রমা মিত্র তার ডেরার আঙিনায় দাঁড়িয়েছিল। আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালো, আসুন—আপনাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে পাঠালো না তো ওরা?

—না।

সেদিন রাতে দেখেছিল এক-রকম আজ সকালে দেখল যেন অন্যরকম। পরনে পরিচ্ছন্ন লাল পেড়ে সাদা জমিনের শাড়ি, গায়ে একটা গেরুয়া রঙের ব্লাউজ। এরই মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে, সামান্য সিক্ত চুলের বোঝা পিঠ বেয়ে কোমরের নীচে নেমে এসেছে। সীঁথিতে সেই সূক্ষ্ম সিঁদুরের আঁচড়। দিনের আলোয় মনে হল গায়ের শামলা রং একটু কালোর দিকে ঘেঁষেছে—কিন্তু জলে ভেজা জুঁই ফুলের মতোই দেখাচ্ছে মুখখানা। কোনোরকম দুশ্চিন্তার দাগ নেই। এইটুকুই তার ব্রতর বিশেষ ফল কিনা বোঝা গেল না।

তাকে সঙ্গে করে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে রমা মিত্র আবার জিজ্ঞাসা করল, কাল আপনার কোনোরকম অসুবিধে হয়নি তো?

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে আর গলা একটু চড়িয়ে অবনীশ জবাব দিল, প্রচণ্ড অসুবিধে হয়েছে। মংলু সর্দার আর তার চেলাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে যে আমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে বুঝিনি।

লজ্জা পেল একটু।—কি করব, আটকে গেলাম যে—

—কোন্ গুরুতর কাজে আটকে গেলে সে-খবর পেয়েছি।... তোমার ব্রত পর্ব ভালো মতো সাঙ্গ হল তো?

—হল একরকম। আপনি মনে মনে রেগে গেছেন দেখছি।...

কি করব বলুন, মাইজির ঠাট বজায় রাখতে কত সময় কত ভড়ংচড়ং করতে হয় জানেন না তো।

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে গেল। পরক্ষণে আসন হাতে বেরিয়ে এসে বাইরের দাওয়ায় পেতে দিল সেটা।—বসুন। ভিতরে গরম।

মাত্র ছ'সাতটা বছর আগেও যে রমণীর প্রাচুর্যের অন্ত ছিল না, আজ তার ঘরে একটা পাখাও নেই। ক্লেশ-বরণের এই রূপটুকুও যেন উপলব্ধি না করে পারা গেল না। অবনীশ আসন নিতে সেও দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন?

—দেখলাম।

—খুব সুন্দর না?

—খুব।...তুমি আছ বলে আরো সুন্দর।

হাসল। উচ্ছ্বাসশূন্য সুন্দর হাসি।—বেশ চাটুবাক্য রপ্ত করেছেন দেখছি, সুমিতা বুঝি পছন্দ করে?

—এটুকু শুধু বাইরের মহিলাদের জন্যে। হাল্‌কা কথার ফাঁকেই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে অবনীশ।...সেই রাতের উদ্‌বেগ বা কাতরতার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করল, কাল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তো জলস্পর্শ হয়নি শুনলাম, আজ কিছু গ্রহণের অবকাশ মিলেছে?

সুচারু বিড়ম্বনাটুকু হাসিতে এসে ঠেকল।—ওই সর্দার বলেছে বুঝি? মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আমি কি করি না করি ও জানে?

—দরজা বন্ধ করে তুমি একধার থেকে ভোজন সমাধা করো এ-খবর নিশ্চয় জানে না।

রমার মুখের হাসি এবারে আরো বিস্তৃত হল। ঝকঝকে সুন্দর দু'পাটি দাঁতেও যেন সেই হাসির ছোঁয়া লাগল। বলল, আপনার কথা-বার্তা আগের থেকে সরস হয়েছে। একটা আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, খাওয়া-না খাওয়া দুটোই অভ্যাসের ব্যাপার। সে-রকম অভ্যাস করতে পারলে একদিন ছেড়ে তিন দিন না খেলেও টের পাওয়া যায় না বা একটুও শরীর খারাপ হয় না।

অবনীশ গম্ভীর মুখে সায় দিয়ে বলল, আজই আমি এই অভ্যাসটা শুরু করব তাহলে।

—থাক, আপনাকে আর অভ্যাস করতে হবে না। আমার হাসপাতাল দেখেছেন কিনা বলুন—

—বাইরে থেকে দেখেছি।

সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল।—চলুন দেখাই, এসেছেন যখন আপনাকে সহজে ছাড়ছি না এজন্যে আপনার পরামর্শও দরকার।

হাসপাতাল কাছে নয় খুব। পথে অনেকেই দেখল ওদের। প্রায় সকলেরই মুখ দেখে অবনীশের মনে হল সকালে উঠে এভাবে মাইজির দর্শন-লাভ যেন ভাগ্যের ব্যাপার একটা। কেউ এগিয়ে এলো না, কেউ কথা বলল না, হাত মুড়ে নত হয়ে প্রণাম জানিয়েই কৃতার্থ তারা। রমা মিত্রও যেন শুধু মুখের হাসিটুকু দিয়েই তাদের আশীর্বাদ করতে করতে এগোতে লাগল। এবারও একটা সরস কৌতুক মুখে এসে গেছল অবনীশের, বলতে যাচ্ছিল ক'টা দিন এখানে থাকলে সেও না মাইজি ডাকা শুরু করে। কিন্তু বলল না। এই সরল মানুষগুলোর ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে হাল্‌কা কিছু বলতে মনে সরল না।

হাসপাতাল বলতে ছোট্ট খটখটে দালান একটা। একটা লম্বা হল্‌, আর তার পাশে বড় ঘর একখানা। হল্‌-এ গোটাকতক দড়ির বেড পাতা। কয়েকজন রোগীও আছে। পাশের ঘরটা ডাক্তারের কোয়ার্টার, চেম্বার, ডিসপেনসারি—যাবতীয় কিছু। ডাক্তারটি আশী বছরের এক উত্তর-প্রদেশের বুড়ো। মাঝবয়সে ভদ্রলোকের স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গ নৌকা-বিপর্যয়ে গোমতীর জলে ডুবে মরে। সেই থেকে ভদ্রলোক ছন্নছাড়ার মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। বছর কয়েক এইখানে মাইজির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে আটকে গেছেন। তাঁরই সহায়তায় রমা মিত্র এই হাসপাতাল করতে পেরেছে। এর আগে লোকগুলো যাচ্ছেতাইভাবে মরত। কঠিন রোগে পড়লেও শরীরের ওপর অন্ধ সংস্কারগত অত্যাচার চালিয়ে যেত। মাইজির

প্রভাবে আর বুড়ো ডাক্তার মহেশ্বর ভার্গবের চেষ্টায় চিকিৎসার প্রতি এখন ওদের কিছুটা আস্থা এসেছে। মহেশ্বর ভার্গব শুধু ডাক্তার নন এখানকার, নিজেই নার্স নিজেই কম্পাউণ্ডার। রোগীর চাপ বেশি না থাকলে লম্বা ওষুধের লিস্ট নিয়ে দূরের শহরে চলে যান, এবং এক-এক বোঝা ওষুধ কিনে নিয়ে আসেন। দরকার হলে এই বয়সে ছুরিও ধরেন! মেঠো পথ ভাঙতে ভাঙতে ডাক্তার ভার্গবের প্রসঙ্গে রমা অনেক কথাই বলেছিল। শুনে অবনীশেরও ভালো লেগেছে।

পরিতৃপ্ত মুখ অতি বৃদ্ধ ডাক্তার ভার্গবের সঙ্গে রমা আলাপ করিয়ে দিল। ভদ্রলোক আগন্তুক দেখে বৃদ্ধ ভারী খুশি। শীর্ণ ঢ্যাঙা মানুষ। দেহে জরার অধিকার স্পষ্ট, তা সত্ত্বেও তাজা মনে হয় লোকটিকে। অবনীশের পরিচয় পেয়ে প্রসন্ন খেদে বললেন, বিঠলের খুব ভাগ্য, এখানে ভদ্রলোকের মুখ দেখা যায় না বড় একটা। আপনি মাতাজীর আত্মীয় যখন, আমাদেরও পরম আত্মীয় ...এতকাল না এসে আমাদের বঞ্চিত করেছেন কেন?

সত্যিই ভালো লাগছিল অবনীশের। হাসিমুখেই জবাব দিল, সেটা আপনাদের মাতাজীরই বিবেচনা বা অবিবেচনার ফল!

বৃদ্ধ ভার্গব এ-প্রসঙ্গের সেখানেই ছেদ টেনে দিলেন। হাসপাতাল দেখাতে দেখাতে এ-কথা সেকথার পরে বললেন, আপনারা থাকতে আমাদের মাতাজীর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে! টাকা-পয়সা ছাড়াও আনন্দ পায় এমন দু'একজন হতভাগা-মার্কা ডাক্তার আর সেবা করার লোক পাঠান। ডাক্তার ছেড়ে একটু লেখাপড়া জানা লোক পেলেও আমি তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারি। আশী বছর হয়ে গেল, নোটিস পেয়েই বসে আছি, এরপর কি হবে?

রমা বলল, আপনার নোটিশ পেতে ঢের দেরি এখনো। সাগ্রহে অবনীশের দিকে ফিরল। —কিন্তু সত্যিই লোক দরকার, চেষ্টা-চরিত্র করে দেখুন না একটু। ...তাছাড়া সরকারী ব্যবস্থায় এখানে কিছু

হতে পারে কিনা তাও জানি না। জায়গা মতো সুপারিশ করতে পারলে কতরকম তো হয় শুনি। একটু দেখবেন?

তার চোখে মুখে সত্যিকারের আকুতি লক্ষ্য করল অবনীশ। আশ্বাস দিতে পারলে নিজেই খুশি হত। পাহাড় জঙ্গলের নুড়ি পাথর নিয়ে তার কারবার। তবু মাথা নাড়ল, চেষ্টা করবে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এরপর রমা তাকে নিজেদের হাতে তৈরি বাঁধ দেখালো। চাষের জমিজমা আর জলের ব্যবস্থা দেখালো। সব-কিছুর মধ্যেই জীবন-যুদ্ধের এক প্রচণ্ড প্রয়াস সুস্পষ্ট।

আরো দুটো দিন কেটে গেল। নিরিবিলিতে অনেক কথা মনে আসে তার, কিন্তু ক্ষোভ জমা হতে থাকে। সেই প্রসঙ্গে কথা তোলার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওই মেয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, ঠিক সময় সেটা নয়। সময় আসবে, সুযোগও পাবে। পারেখকে কাজে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে অবনীশ একলাই আছে। মন্দ কাটছে না তার। মাইজির ভাই, স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে খুব খাতির তার। যাবার কথা তুললে রমা বলে, আপনাকে আটকে রেখে খুব কষ্ট দিচ্ছি, কিন্তু ছাড়তে ইচ্ছে করে না—

অবনীশ গম্ভীর জবাব দিয়েছে, খুব খারাপ কথা, সাধিকাদের মায়াবদ্ধ হওয়া ভালো নয়।

—আমি সাধিকা?

অবনীশ ও-পথে আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার বিস্ময় কম নয়। সে সময় আর সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে, কিন্তু ক'টা দিনের মধ্যে কলকাতার একজনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মহিলার এতটুকু আগ্রহ দেখল না, এতটুকু কৌতূহল না। অথচ প্রথম সেই রাতের সেই বিবর্ণ ব্যাকুল মূর্তিও চোখের সমুখ থেকে মুছে যায়নি তার।

পরের রাত্রিতে রমার ডেরায় বসেই কথাবার্তা হচ্ছিল। আজ

আবার একটু গম্ভীর দেখছে তাকে। নিজে থেকেই একসময় জিজ্ঞাসা করল, আপনি কবে যাবেন ভাবছেন?

—মাইজি বাধা না দিলে কালই।

—বেশ।···সুমিতাকে আমার কথা বলবেন, সম্ভব হলে দুজনেই আর একবার আসবেন।

ঠাণ্ডা মুখে অবনীশ জবাব দিল, সুমিতার কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমার আসার ইচ্ছা থাকল।

শুনে মহিলা কৃতজ্ঞ যেন। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর আরো একটু স্থির যেন। —কলকাতার খবর কি, বলুন।

অবনীশ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। বলল, তার আগে একটা কথার জবাব দাও, শুনলে তোমার শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে?

—কি করে বলব, মানুষ তো···কিন্তু এ-কথা কেন, ব্যাঘাত ঘটার মতোই কিছু শুনতে হবে?

জবাব এড়িয়ে অবনীশ আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার সত্যিই শোনার ইচ্ছে আছে?

প্রায় নিরুত্তাপ জবাব এলো, সেই প্রথম রাতে আপনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন! আমি তার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। ···সেদিন ও-রকম করে বলেছিলেন কেন? আমি যতদূর খবর রাখি আপনার বন্ধু বিয়ে করেছেন···তার ফল কি ভালো হয়নি?

অবনীশ সত্যিকার অবাক।—বিয়ে করেছে তুমি খবর পেলে কি করে?

···কলকাতা ছেড়ে যখন চলে আসি আমার সঙ্গে এক পুরনো আয়া ছিল—সারদা, এখানে আসার বছর দুই বাদে তার খুব অসুখ হয়ে পড়ে। একটু সেরে উঠতে আর এখানে থাকতে চায়নি—আমি তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সম্ভব হলে খুব গোপনে আপনার বন্ধুর খবরটা শুধু আমাকে জানাতে বলেছিলাম। সে লিখেছিল···।

খানিক নির্বাক বসে থেকে অবনীশ মুখ খুলল। খুব নিস্পৃহভাবে এক উদ্‌ভ্রান্ত বে-পরোয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন-চিত্রটি তেমনি সংক্ষেপে তুলে ধরল। ...রমা মিত্র চলে আসার পর অন্ধ আক্রোশে প্রশান্ত ঘোষ ছ'মাসের মধ্যে এক মেয়েকে ঘরে এনেছিল। বড় লোকের তেজী মেয়ে, নাম মল্লিকা। কিন্তু আরো ছ'মাস না যেতে দুটো জীবনই সবেগে বিপরীতমুখী হয়েছে। রমা মিত্র অথবা মালবী মিত্রর খবর মল্লিকার জানতে বাকি থাকেনি। সে আঘাত পেয়েছে, তবু গোড়ায় গোড়ায় অন্তত আঘাত দিতে চায়নি। কিন্তু প্রশান্তর ব্যবহার দিনকে দিন এমনই হয়ে উঠতে লাগল যে একসময় মল্লিকাও ফুঁসে উঠল। ...মেয়েদের অস্তিত্বটাই ঘৃণার বস্তু প্রশান্তের চোখে, আক্রোশ মেটানোর বস্তু—ফলে আঘাত পেলে দ্বিগুণ আঘাত হানে মল্লিকা। রমা মিত্রর সম্পর্কে কটূক্তি করলে লোকটা ক্ষেপে ওঠে দেখে গঞ্জনার ওই রাস্তা ধরেই অবিরাম বিঁধতে চেষ্টা করে তাকে। সে তার বন্ধুবান্ধব, ক্লাব সিনেমা থিয়েটার নিয়ে আছে। একসঙ্গে সাত দিন স্বামীর সঙ্গে থাকে না। তার শুভার্থীরা তাকে ডিভোর্সের পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু মল্লিকা তাতেও ফুঁসে ওঠে, বলে, যে তার জীবন নষ্ট করেছে, ডিভোর্স করে সরে দাঁড়িয়েও তাকে অশান্তির আগুনে জ্বলতে হবে।

...প্রশান্ত বেশ স্থির গতিতে আত্মহত্যার রাস্তা বেছে নিয়েছে এখন। মাত্রা ছাড়িয়ে মদ খায়, অত বড় চাকরিও গেছে। কণ্ট্রাক্টের চাকরি ছাড়ানো হয়েছিল বলে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে হাতে এসেছিল। এছাড়া, বাপ মারা যাবার পরে বসত বাড়ির অংশ ছাড়া আর যে বাড়িটা সে পেয়েছিল সেটাও বিক্রী করে বহু টাকা হাতে পেয়েছিল। সে-সবই দু'হাতে ওড়াচ্ছে এখন পর্যন্ত। আত্মীয়-পরিজন এমন কি বন্ধুবান্ধবরা পর্যন্ত বলতে গেলে প্রায় বর্জন করেছে লোকটাকে।

...হ্যাঁ, প্রদীপের আলোয় একটুও ভুল দেখছে না অবনীশ। সাধিকার নির্লিপ্তি স্থৈর্যে, আর, সব-কিছু সহ্য করার সংযমে ফাটল

ধরেছে। দু'চোখ বড় বড় করে অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে শুনে গেছে। তারপর বেদনায় বিবর্ণ পাণ্ডুর সমস্ত মুখ। কালো চোখের তারায় অসহিষ্ণু ক্ষোভ। আবেগ দমনের চেষ্টায় মাথা নীচু করে আছে একটু। সীথিঁতে সিঁদুর শিখার আঁচড় চোখে পড়ছে। বলা শেষ হয়েছে, অবনীশের এবার কিছু শোনার প্রতীক্ষা।

রমা মিত্র মুখ তুলল, বলে উঠল, মল্লিকা কেমন মেয়ে? ও-রকম সরল একটা ভালোমানুষকে ফেরাতে পারল না? একটা দুশ্চরিত্র মেয়েকে ভোলাতে পারল না?

অবনীশ জবাব দিল, দুশ্চরিত্র নয় বলেই পারল না বোধহয়···।

মাথা ঝাঁকিয়ে যেন নিজের ওপরেই তৃপ্ত রোষে বলে উঠল, না না আমি কত খারাপ আপনারা জানেন না—কিন্তু এ-রকম হতে দিচ্ছেন কেন? আপনারা চেষ্টা করছেন না কেন?

একটু কঠিন সুরেই অবনীশ জবাব দিল, যেটুকু সম্ভব করেছি, তার বেশি কিছু করার সময় নেই।···নিজেকে খারাপ বলছ, খারাপ কাকে বলে আর ভালো কাকে বলে ঠিক জানো তুমি? যাক, এখন আর উতলা হয়ে লাভ নেই—এতবড় শাস্তিটা ওর মাথায় চাপিয়ে দেবার আগে ভাবলে পারতে। নিজে ভালো হওয়ার দায়ে তুমি পাগল হয়েছিলে, আর একটা লোকের পরিণাম কি হতে পারে সেটা ভাবনি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু'জনেই নির্বাক নিস্তব্ধ তারপর।

—একটা কথা বলব? অবনীশ চিন্তাচ্ছন্ন, গম্ভীর।

—বলুন। রমা মিত্রও নিজের মধ্যে ফিরে আসতে চেষ্টা করছে।

—প্রশান্তটা সত্যিই পাগল একটা, নইলে এর থেকেও বড় আঘাত লোকে সহ্য করে থাকে।···যাক, তোমার কথা শুনলেই ও হয়তো এখানে ছুটে আসবে। আর এতদিন বাদে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি অসাধ্যসাধন করতে পারো, ওই লোককে ফেরানো হয়তো তার থেকেও কঠিন এখন···তবু একমাত্র তুমিই হয়তো চেষ্টা

করে দেখতে পারো। তোমার কথা জানাব তাকে? এখানে আসতে···বলব?

জবাব দেবার আগে নিজের সঙ্গে যুঝতে হল যেন মহিলার। জিজ্ঞাসা করল, সঙ্গে মল্লিকাকেও পাঠাতে পারবেন?

—না। তাকে জানলে তুমি এ আশা রাখতে না।

—কিন্তু আমার তা মনে হয় না, আপনার বন্ধুর কোনো একটা দিক ভালো করে চিনে না থাকলে মল্লিকা এতদিনে ডিভোর্স করত —এ-ভাবে লেগে থাকত না।

যুক্তিটা বিরক্তিকর ঠেকল অবনীশের কাছে। কারণ আত্মীয়তা নিবন্ধন হেতু তারা পর্যন্ত ওই মহিলার চক্ষুশূল এখন। তর্কের মধ্যে না গিয়ে বলল, আমার কথা শুনে রাখো সে আসবে না···তাহলে কি করব, একটা শেষ চেষ্টার জন্য তাকে তোমার খবরটা দেব কি না?

জবাব দিতে সময় নিল। সমস্ত সত্তা সংযমে বেঁধেছে আবার। শান্ত, কমনীয় কিন্তু প্রায় নিস্পৃহ।—বলবেন।···কিন্তু আমি সকলের মা এখানে···কতটুকু আর করতে পারব।

···এই কাহিনীর মূলে পৌঁছতে হলে আজ থেকে বহু বছর পিছনে এক সাধারণ শিল্পী বাপের এক অতি সাধারণ মেয়ের কাছে ফিরে আসতে হবে—যে মেয়ের নাম রমা মিত্র। বাড়িতে দুটো ছোট ভাই আর ওই বাপ। মা নেই। ফলে মেয়েটা অসময়ে বাড়ির গিন্নী। ভাই দুটো ছেড়ে বাবা পর্যন্ত সর্বব্যাপারে তার মুখাপেক্ষী। অভাব অনটন দারিদ্র্যের সংসার। খরচের টানাটানির মধ্যে পড়লে সেই মেয়ে টাকা চেয়ে বাবাকে বিব্রত না করে অপেক্ষা করতে শিখেছে। টাকার জন্য ভাই দুটো বাবাকে উত্যক্ত করলে তাদের ধমক-ধামক করে, আবার মুশকিলের আসানের কোনো পথ না পেয়ে ভয়ানক অসহায় বোধ করে এক-একসময়।

এম-এ পড়া এই অতি সাধারণ মেয়ে রমা মিত্র মামুলি প্রেমে পড়েছিল একটি বনেদী ঘরের ছেলের সঙ্গে যার নাম প্রশান্ত ঘোষ। সেও তেমন একটা অসাধারণ ছেলে নয়, য়ুনিভার্সিটির অমন স্কলার প্রতি বছর গণ্ডায় গণ্ডায় বেরোয়। কিন্তু রমা মিত্র প্রায় অসাধারণই ভাবত তাকে। ভাবতে ভালো লাগত।

রমা রূপসী কিছু নয় যে নিজের সম্পর্কে বাড়তি গর্ব পুষবে। গায়ের রং বলতে গেলে কালোই। স্বাস্থ্যটা ভালো এই যা। আর যাদের দরদ আছে তারা নাক মুখ চোখ ভালো দেখে। তবে ফোটো ওর নিখুঁত সুন্দর ওঠে। ফোটোতে সত্যিকারের চেহারা থেকে ঢের বেশি সুন্দর মনে হয়। ওতে তো আর গায়ের রং ধরা পড়ে না।

ওর এই ফোটো নিয়েই একবার এক কাণ্ড ঘটে গেছল। রমা তখন সবে বি-এ পাস করেছে। তখনো মা নেই ঘরে। বি-এ পাস করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী বাপের কর্তব্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তক্ষুনি সে-কর্তব্য সমাধা করার বাসনা। মা-মরা অত ভালো মেয়ে তাঁর, যেমন করে হোক ভালো ঘরে দিতে হবে। ভালো ঘর কাকে বলে সে সম্বন্ধেও ভদ্রলোকের বাস্তব ধারণা কম। তাছাড়া, ভালো ঘরে মেয়ে দেবার পর সংসারের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা নিয়ে ভদ্রলোক মাথা ঘামাননি। তাঁর ধারণা দুনিয়ায় দিন অচল হয়ে থাকে না।

ব্যস্তসমস্ত মুখে নিয়মিত তখন পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। খবরের কাগজ পড়তে বাবার পাঁচ মিনিটও সময় লাগত না। হঠাৎ তাঁর এই মনোযোগ দেখেও মেয়ে সঠিক কিছু বোঝেনি। সংসারের অনটন টের পেয়ে বাবা চাকরির বিজ্ঞাপন দেখেন কিনা এই সন্দেহও মেয়ের মনে ডাক দিয়েছিল। যাই হোক, ভদ্রলোকের একদিন একটা বিজ্ঞাপন মনে ধরল। বিজ্ঞাপনদাতারা রূপসী মেয়ের সন্ধান করছেন—নিখুঁত রূপটুকুই তাঁদের একমাত্র চাহিদা। দেনাপাওনার প্রশ্ন নেই—বড় ঘরের বিলেত-ফেরত ছেলে, বয়েস চব্বিশ পঁচিশ—ওই বয়সেই ষোল সতের শ' টাকা মাইনের চাকরি করে।

শিল্পী বাবার বিচারে ওটিই তাঁর মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। মেয়েকে কিছুই জিজ্ঞাসা না করে তার একখানা ফোটো-সহ বিজ্ঞাপনের জবাব চলে গেল। নিজের মেয়ের কথা লিখতে বসে চিঠিতে তিনিও মেয়ের সম্পর্কে কম লিখলেন না। যথা—মেয়ে তাঁর সত্যিকারের রূপসী, স্বাস্থ্য চমৎকার—কখনো অসুখ-বিসুখ করে না, ঘরে স্ত্রী নেই ফলে এই বয়সের মেয়ে তাঁর সংসারের ভার বহনে সুপটু, লেখা-পড়ায়ও দস্তুর মতো ভালো। বাংলা অনার্সে বি-এ পাস করবে ইত্যাদি, ইত্যাদি!

চিঠি পড়ে না হোক, মেয়ের ছবি দেখে পাত্রপক্ষ মুগ্ধ। সাগ্রহে চিঠির জবাব দিলেন তাঁরা। ফলে মেয়ের বাবারও দ্বিগুণ উৎসাহ, একটা কাজের মতো কাজ করেই ফেলেছেন যেন। দিনক্ষণ ঠিক করে পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এলেন। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত মেয়েকে বাপ কিছুই জানানো দরকার বোধ করেননি। দেখতে আসবে—আসবে, তার জন্য মেয়েকে ব্যস্ত করার কি আছে।

তাঁরা এসে হাজির হতে টনক নড়ল একটু। নতুন একটা ছবি আঁকতে বসার তন্ময়তায় দিনক্ষণ ভুলেই গেছেন। সরঞ্জাম সব এদিক-ওদিক ঠেলে সরিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের বসতে দিলেন। তারপর ব্যস্তসমস্ত মুখে মেয়ের কাছে এসে বললেন, এই একটা ফর্সা শাড়ি-টাড়ি পরে আয় তো, তোকে দেখতে এসেছে।

এ-রকম কাণ্ড কে কল্পনা করতে পারে, মেয়ে আকাশ থেকে পড়ল একেবারে।—দেখতে এসেছে মানে?

—আঃ, রেডি হয়ে আয় না, এতবড় মেয়ে, দেখতে এসেছে মানে বুঝিস না!

বুঝল। বোঝার পরে দুই চক্ষু বিস্ফারিত। তারপর সংকটাপন্ন মুখ। রাগে দুঃখে কান্না পাবার উপক্রম তার। বাক্সয় একটা ভালো জামা বা কাপড়ও রেডি করা নেই। আজ মা থাকলে বাবাকে মজা বুঝিয়ে ছাড়ত। ভাই দুটো প্রথমে হাঁ হয়ে গেছল, কিন্তু তারাও বাবার মতোই, ফিসফিস করে একজন বলল, চলে যা না, অত ঘাবড়াবার কি আছে—পছন্দ হয় হবে না হয় না হবে।

হাতের কাছে পেয়ে রমা তাকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কি আর করা যাবে, রাগে জ্বলতে জ্বলতে তারপর শাড়িটা আর গায়ের জামাটা বদলে বাবার ঘরে এসে হাজির হয়েছে। বাবার তাড়ায় ভালো করে মাথাটা আঁচড়ে আসার পর্যন্ত সময় পায়নি।

কিন্তু নাটকের সবটাই বাকি তখনো। পাত্রপক্ষ এই মেয়ে দেখে একেবারে হাঁ। এ-রকম কালো মেয়ে আশাই করেনি তারা। এমন কি ফোটো যার পাঠানো হয়েছে এ সেই মেয়ে কিনা এমনও সন্দেহ হতে ফোটোখানা বার করে মিলিয়ে নিয়েছে।—সেই মেয়েই বটে কিন্তু তাদের চোখে আর বিবেচনায় আকাশ পাতাল তফাত। মনে মনে তারা রেগেই গেল।

মামুলি দুই একটা কথা বলে রমাকে চলে যেতে বললে। ঘরে ফিরে এসে রমা ভাইদের সঙ্গে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। এ-ব্যাপারে খুব একটা লাজ-লজ্জা নেই! রাগ গিয়ে এখন কৌতূহলটুকুই বড়। যদিও চোখ-কান বুজে রমা বলে দিতে পারে মেয়ে তাদের পছন্দ হয়নি।···বয়স্ক ভদ্রলোকের পাশে ওই পালিশ-করা লোকটিই পাত্র হবে। সে একবার মুখ তুলে তাকিয়েই আর ওর দিকে ফেরেনি।

কানে এলো, ও-ঘরে ওই বয়স্ক ভদ্রলোক—খুব সম্ভব ছেলের বাবা বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই মেয়ের বাবাকে বলছেন, আপনার মেয়ে অত কালো সে-কথা লেখেননি কেন, ফোটো দেখে রং বোঝা যায়? তার ওপরে আপনি লিখেছেন মেয়ে সত্যিকারের সুন্দরী, অপছন্দ হবার কারণ নেই—নিজেদের মেয়ে সবাই ভালো দেখে, তা বলে এতটা বাড়িয়ে লেখার অর্থ কি?

শুনে বাবাও হয়তো হকচকিয়ে গেছলেন একটু। পরে তাঁর গম্ভীর গলাও কানে এলো।—আপনাদের পছন্দ হয়নি তাহলে?

—পছন্দ হবে আপনি আশা করেছিলেন?

—করেছিলাম। আচ্ছা নমস্কার।

তাঁরা চলে যেতে অগ্নিমূর্তি হয়ে রমা ঘরে ঢুকেছিল। বাবার

অপমানে ভিতরে ভিতরে কান্না পাচ্ছিল—অপমান বইকি, বাবাকে প্রকারান্তরে মিথ্যেবাদী বলে গেছে !

—বাবা, ওঁদের তুমি কি লিখেছিলে ?

ওই পাত্রপক্ষের ওপর বাবা তখনো বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ। মেয়ের সম্পর্কে তিনি এতটুকু আতিশয্য করেছেন ভাবছেন না। জবাব দিলেন, লোকগুলো একনম্বরের ইয়ে—ওঁরা সুন্দরী মেয়ের খোঁজ করেছিলেন, আমি লিখেছিলাম আমার মেয়ে সুন্দরী···ফোটোও পাঠিয়েছিলাম।

—কেন ? কেন এ কথা তুমি ওদের লিখতে গেলে। না, দেখে শুধু তোমার চিঠি পড়েই ওঁরা আমাকে নিয়ে যাবেন ভেবেছিলে ? এ-রকম ঝাঁঝালো সুরে রমা কোনদিন বাবার সঙ্গে কথা বলেছে কিনা সন্দেহ।

মেয়ের রাগ দেখে আর সেই সঙ্গে চোখে জল দেখে বাবা অবাক।

—কেন রে···দেখেই তো নেবেন ভেবেছিলাম ! ও বুঝেছি, তা দেখ আমি মিথ্যে লিখিনি রে, ওঁদের চোখ নেই তাই ওঁরা সুন্দর দেখলেন না ! আমি কালো লিখিনি বটে, কিন্তু রংটাই কি সব নাকি !

—ওসব আমি শুনতে চাই না। রাগে-দুঃখে মেয়ের কান্না-ভেজা ঝাঁঝালো গলার স্বর, আর কখনো তুমি এরকম সেধে অপমান ডেকে আনবে কিনা বলো, আর কখনো কাউকে চিঠি লিখবে কিনা বলো—

বাবা একেবারে ফাঁপড়ে পড়লেন যেন। আমতা আমতা করে বললেন, না লিখলে তোর বিয়ে দেব কেমন করে ?

মাথা ঝাঁকিয়ে রমা বলেছিল, বিয়ের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, সে যখন যা হবার হবে—তুমি আর কাউকে এ-রকম লিখবে কিনা বলো ?

—আচ্ছা লিখব না।

সেই থেকে শিল্পী বাপ নিষ্ক্রিয় এবং নিশ্চিন্ত। মেয়ে আর তার ভাই দুটোও।···না তখনো রমা মিত্রর আকাঙ্ক্ষার কোনো বিশেষ দর্পণে কোনো ছেলের ছায়া পড়েনি। কলেজে বা পথে যেতে আসতে

তার প্রতি যে-সব ছেলের আগ্রহ লক্ষ্য করত বা অনুভব করত তাদের নিয়েও মাথা ঘামায়নি কখনো। ছেলেদের ওই গোছের প্রগলভ দিকটা অবজ্ঞা করার মতো মনের জোরও ছিল তার। কেবল প্রাণের বন্ধু সুমিতার মুখে শুনেছিল তার এক মাসতুতো দাদার ভিতরে ভিতরে ওকে পছন্দ। সেও বড় লোকের ছেলে, এই পছন্দের দৌড় কতদূর তা নিয়েও সক্রিয়ভাবে খুব মাথা ঘামায়নি; তবে মনে মনে একটু রোমাঞ্চবোধ করেছিল বটে।

সুমিতার মা-ও ওকে ভালো বাসতেন, কতদিন তো ওকে শুনিয়েই বলেছেন, আ-হা, তুই যদি ফর্সা হতিস, কত বড় বড় ঘর থেকে তোকে লুফে নিয়ে যেত। রমা হাসত। সুমিতার সঙ্গে তার মায়ের খেদ নিয়ে হাসাহাসি করত। কিন্তু মনে মনে রমারও ধারণা, খুব না হোক মোটামুটি ফর্সা হলেও হয়তো লুফে নেবার ব্যাপারে আটকাতো না। কিন্তু রমাকে মোটামুটি ফর্সাও কেউ বলবে না।

তবে গর্ব করার মতো রমার গুণও একটু ছিল; খুব সুন্দর থিয়েটার করত স্কুল আর কলেজে পড়তে। মেয়ে কলেজের সেই থিয়েটার দেখে অনেক ছেলে অনেক রূপসী মেয়ের থেকেও ওর দিকে বেশি ঝুঁকত। রমার বাবা এক ফার্মের বাঁধা মাইনের কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হলেও সমস্ত রকমের শিল্পকলা তাঁর প্রাণের জিনিস। অভাবের দায়ে সত্যিকারের শিল্পের অপমৃত্যু ঘটেছে এমন একটা খেদ সর্বদাই মনের তলায় ছিল। মানুষটাও উদার প্রকৃতির। মেয়ের এই সখে বাবা বাধা দেননি কখনো, বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

এম-এ পড়ার সময়েও কি এক উপলক্ষে পাড়ার মেয়েরা মিলে থিয়েটার করেছিল। রমা মিত্র তার নায়িকা এবং সর্বাধিনায়িকা। বাবাকে ধরে স্টেজ সাজিয়ে নিয়েছিল। আর তারপর জমজমাট থিয়েটারই করেছিল বটে। দু'দুটো মেডেল পেয়েছিল সেই থিয়েটার করে। স্কুল-কলেজে মেডেল অমন আরো অনেক পেয়েছে। কিন্তু সেবারের ওই থিয়েটারের পর দু'টো কাণ্ড ঘটে গেছল। প্রথম ঘটনা থিয়েটার শেষ হওয়ার রাতেই।

বাবার কাছে ইদানীং প্রায়ই তাঁর এক সতীর্থ আসত। সতীর্থ বলতে সে নিজেও একজন শিল্পী। বাবার থেকে বয়সে অনেক ছোট কিন্তু রমার থেকে কম করে দশ বছরের বড়। নাম দেবব্রত। বাবা ডাকতেন দেবু। বাবার স্নেহের পাত্র তাই রমা বা তার ভাইরাও তাকে একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখত। রোগা ঢ্যাঙা ছন্নছাড়া মূর্তি। তার সময়জ্ঞান ছিল না, যখন-তখন আসত। আর অবধারিত, না খেয়ে আসত। বাবা মুখ দেখলেই বুঝতে পারতেন খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি হয়নি। সকালে বা বিকেলে এলে বাবা তার জন্য চা জল-খাবারের হুকুম করতেন—দুপুরে বা সন্ধ্যার পর এসে হাজির হলে বাবা ওকে ডেকে বলতেন, দেবু খেয়ে যাবে।

ভাইরা, বিশেষ করে পরের ভাই বাদল এ-জন্যে খোলাখুলি বিরক্তি প্রকাশ করত। সে সাদা-সাপটা প্র্যাকটিক্যাল ছেলে, নিজেদের মনের মতো খাওয়া জোটে না, তার মধ্যে বাইরের লোক। দেবব্রত এলেই রমার তাকেও সামলাতে হত, কখন কি বে-ফাঁস বলে বসে ঠিক নেই। তাছাড়া বাবার কানে গেলে রক্ষে নেই। বাবার মতে তাঁর দেবু একজন জাতশিল্পী! অভাবের দায়ে কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হয়নি। বার কয়েক ভালো ভালো চাকরি পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে, যা তিনি নিজে পারেননি। শিল্পী জীবনের এই আপোস-শূন্য দিকটা বাবার চোখে শ্রদ্ধার বস্তু।

…সেই দেবব্রতও এসেছিল থিয়েটার দেখতে। স্টেজ সাজানোর ব্যাপারে—বাবা তারও সাহায্য নিয়েছিলেন, ফলে তাকেও আমন্ত্রণ জানানো স্বাভাবিক।

থিয়েটারের পর ফিরতে একটু রাতই হয়েছিল রমার। সে তো শুধু নায়িকাই নয়, ম্যানেজমেন্টের দায়ও তারই। মোটামুটি হিসেব নিয়ে খুশি মনেই বাড়ি ফিরেছিল। বহু লোক অযাচিতভাবে এসে প্রশংসা করে গেছে। আর, টাকাও যা আশা করা গেছল তার থেকে বেশি উঠেছে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে বিব্রত মুখ। বাবার ঘরের ভিতর

দিয়ে ঢুকতে হবে। এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন, কড়া নেড়ে তার ঘুম ভাঙাতে হবে। ভাই দুটোও এতক্ষণ জেগে বসে নেই। বাবার ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে দেখেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। ওর অপেক্ষাতেই ওটা জ্বলছে বোধহয়। সবুজ আলো ছেড়ে জোরালো সাদা আলো জ্বেলেও বাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারেন।

জানলা দিয়ে উঁকি দিয়েই সে হতভম্ব। বাবা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন ঠিকই, তার পাশেই নিশ্চল মূর্তির মতো বসে আছে দেবব্রতবাবু। ভাবল, রাত হয়ে গেছে বলেই হয়তো বাবা তাকে থেকে যেতে বলেছেন। বাবার ওইরকম কাণ্ড।

খুব চাপা গলায় ডাকল, দরজাটা খুলুন।

অত রাতে কানে যাবার কথা, কিন্তু গেল না। একটু উসখুস করে রমা আবার ডাকল, কিন্তু লোকটা নিশ্চল মূর্তির মতো বসে, গলা দিয়ে বার দুই তিন শব্দ বার করেও কোনো ফল হল না। লোকটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে কিনা রমা ভেবে পেল না।

অগত্যা কড়া নাড়ার জন্য জানলা থেকে সরে এসে দরজায় হাত দিল। কিন্তু কড়া নাড়ার দরকার হল না, হাত পড়তেই দরজা একটু ফাঁক হয়ে গেল। ঠেলে দেখে দরজা খোলা, ভিতর থেকে কেউ বন্ধ করেনি।

বিরক্তি চেপে ঘরে পা দিল, এই সব শিল্পীরা যে কোন্ জগতে বাস করে কে জানে। সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করল, তবু ছিটকিনি হুড়কো লাগানোর সময় শব্দ একটু হলই।...কিন্তু ও-দিক ফিরে লোকটা তখনো নিশ্চল বসে—একটুও হুঁস ফেরেনি।

পায়ে পায়ে এগলো। শয্যার পাশ কাটিয়ে ফিরে দাঁড়াল। বাবার নাক ডাকছে, তাঁর পাশে দেবব্রতর বালিশ। কিন্তু সে বসে আছে তো বসেই আছে—আর চোখ দুটোও সটান খোলা। সবুজ আলোয় তার সেই চোখ কোন্ সুদূরের শিল্পরাজ্যে বিচরণ করছে তা অবশ্য বোঝা গেল না।

...মাথাটা সামান্য ঘুরল, তারপর ওই দু'চোখ তার মুখের ওপর

উঠে এলো। কিন্তু তারপর আর নড়েচড়ে না, আর মুখেও কোনো কথা নেই।

বাবা একবার ঘুমুলে সহজে সেটা ভাঙার ভয় নেই। তবু চাপা গলায় রমা বলল, রাত হয়ে গেল বলে আটকে গেছেন বুঝি··· বসে আছেন কেন, কিছু অসুবিধে হচ্ছে ?

বিড়ম্বনার একশেষ। কোনো জবাব নেই। মুখের দিকে চেয়েই আছে। রমার মনে হল, তার কথা এক বর্ণও কানে ঢোকেনি। আর ওই সবুজ আলোয় মনে হল, দৃষ্টিটা যেন অনেক দূরে ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ বুঝি ওর মুখের ওপর এসে সজাগ হয়েছে। সজাগ হয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যেও যেন কেমন আত্মহারা ভাব একধরনের।

রমা আবার বলল, চুপচাপ বসে কি ভাবছেন অত—আমাদের থিয়েটারের কথা নয় তো ?

অবশ্য এত রাতে ঘুমন্ত বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থিয়েটারের প্রশংসা শোনার লোভ খুব ছিল না। তবু এবারে চমক ভাঙবে এবং কিছু শুনবে আশা করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তেমনি স্থাণুর মতো বসে আছে, আর তেমনি চেয়ে আছে ওর দিকে। চাউনিটা আরো একাগ্র, আত্মবিস্মৃত।

রমা ঘাবড়েই গেল। পায়ে পায়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করল সে। পাশের ঘরটা অন্ধকার। মাঝের দরজা আবজে দেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে আবারো ধাক্কাই খেল একটু। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, ওই লোক সবুজ আলোয় বসে। কিন্তু অন্ধকার ফুঁড়েই যেন তার দুটো চোখ ওর ওপর চড়াও হয়ে আছে।

মাঝের দরজা এমনি ভেজানো থাকে, ছিটকিনি নেই, তার দরকারও হয় না। দরজা দুটো টেনে দেবার পরেও কেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রমা। লোকটার হঠাৎ মাথা-টাথা বিগড়েছে কিনা বুঝে উঠল না।

ও-ধারের চৌকিতে দুই ভাই শুয়ে। এই কোণে রমার শয্যা। আলো না জ্বেলে অন্ধকারেরই জামা-কাপড় বদলে নিল। পেন্ট তুলে

মুখ-হাত ভালো করে ধুয়েই এসেছিল, রাতের আহারও সেখানেই সমাধা হয়েছে। এবারে শুয়ে পড়ার কথা। কিন্তু শোয়া গেল না।

পায়ে পায়ে আবার মাঝের দরজার সামনে দাঁড়াল। খুব সন্তর্পণে একটা দরজা এক ইঞ্চি-প্রমাণ ফাঁক করল। তারপর আবার সেই ধাক্কা। ও-দিক থেকে এই অন্ধকার ঘরে তাকে দেখতে পাচ্ছে না নিশ্চয়, কিন্তু নির্নিমেষে এই দিকেই চেয়ে আছে। সেই রকমই অদ্ভুত চাউনি।

ভয়ে ভয়ে সরে এসে রমা নিজের শয্যায় বসল। সমস্ত রাত ধরে ওই ঘরে সবুজ আলো জ্বলবে কিনা, আর সমস্ত রাত ওই লোক ওমনি বসে কাটাবে কিনা কে জানে। কি হতে পারে কিছুই তার মাথায় আসছে না।

আরো কতক্ষণ কেটেছে হিসেব নেই। বোধহয় অনেকক্ষণ। শয্যায় শুয়ে রমা এ-পাশ ও-পাশ করছে। আর মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছে। সামান্য ফাঁক দিয়ে ও-ঘরের সবুজ আলোর আভা টের পাচ্ছে।

হঠাৎ সেটা আর দেখা গেল না। অর্থাৎ আলো নিভল। রমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গেল। কিন্তু ফেলা গেল না। তার আগেই একটা শব্দ শুনে উৎকর্ণ। শব্দটা চেনা। অনভ্যস্ত হাতে বাবার ঘর থেকে বাইরে বেরুনোর দরজার ছিটকিনি আর হুড়কো খোলার শব্দ। রমা তক্ষুনি শয্যা ছেড়ে নেমে এলো। মাঝের দরজা ফাঁক করে দেখল, যা ভেবেছে তাই। বাইরে বেরুনোর দরজা খুলে লোকটা বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার আলোয় অস্পষ্ট মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু একটু বাদেই আর দেখা গেল না। অর্থাৎ দরজা দুটো বাইরে থেকে আবার টেনে দেওয়া হল।

...কি কাণ্ড রে বাবা! লোকটা এই নিঝুম রাতে দরজা খুলে গেল কোথায়? এ-ভাবে খোলা ফেলে চলে গেলে ঘরে চোর ঢুকতে পারে সে-খেয়ালও নেই।

রমা এ-ঘরে এলো, তারপর পায়ে পায়ে বাইরের দরজার দিকে এগলো। বন্ধ করার আগে কি ভেবে দরজা খুলে দেখতে গেল লোকটাকে চোখে পড়ে কি না। কিন্তু দরজা খুলেই বিষম চমক আর ভয়ানক অপ্রস্তুত।

দরজার ও-পাশেই দেবব্রত সিঁড়িতে বসে। ঘুরে তাকিয়েছে এবং ওকে দেখেছে। রমা কি বলবে বা কি করবে ভেবে পেল না। কিন্তু চুপ করে থাকাও দায়। অস্ফুট স্বরে বলল, আপনি ঘুমুতে পারছেন না কেন?

এইবার জবাব পেল। লোকটা সাগ্রহে ঘুরে বসেছে। গলার স্বরেও অদ্ভুত আবেগ।—আমি ঘুমুতে পারছি না, তুমি বুঝতে পারছ? এই বুঝতে পারাটাই যেন তার প্রত্যাশিত পুরস্কার।—পারবেই তো··· তুমি শিল্পী।

রমা আরো ঘাবড়ে গেল। থতমত খেয়ে বলল, না আপনার কি অসুবিধে হচ্ছে···মানে গরম লাগছে কিনা জিগেস করছিলাম···

জবাবে হাত ধরে লোকটা ওকে আস্তে আস্তে দরজার বাইরে টেনে আনল। ওকে আরো অবাক করে আর ভয় ধরিয়ে পিছনের দরজা দুটো টেনে দিল। তারপর বলল, গরম নয়, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে···সেটা কি-রকম তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। বোসো তোমার সঙ্গে কথা আছে।

একখানা হাত ধরে সিঁড়ির পাশের জায়গাটুকুতে ওকে বসাতে চেষ্টা করল।

রমা বলে উঠল, এত রাতে এখানে বসব কি! আপনি ভিতরে আসুন—

—ভিতরে দাদা ঘুমুচ্ছেন, এ-সব কথা বলা যাবে না।···আচ্ছা বসতে না চাও দাঁড়িয়েই শোনো। তোমাকে আমি অনেকদিন ধরে দেখছি, কিন্তু আসলে তোমাকে আজই দেখলাম—এতদিন দেখিনি।··· আমার কথা বুঝতে পারছ?

বোঝা দূরে থাক, রমার ঘেমে ওঠার দাখিল। ওই হাত থেকে

নিজের হাতটাও ছাড়াতে পারছে না। সর্বাঙ্গ অবশ লাগছে।

চাপা আবেগে দেবব্রত বলে গেল, আজ আমি তোমাকে দেখলাম —শিল্পী দেখলাম। তুমি হয়তো শুধু অভিনয়ই করেছ, কিন্তু তোমার ভিতরের শিল্পীকে দেখোনি—তুমি যে কত বড় শিল্পী তুমি নিজেও জানো না—আন্‌কন্‌শাস্‌ জিনিয়াস।

দিনের আলোয় অথবা স্বাভাবিক পরিবেশে এই কথাগুলোই শুনতে খুশিতে আটখানা হত। কিন্তু তার বদলে কি এক অজানা ভয়ে নির্বাক এখন।

রাতের স্তব্ধতায় লোকটার চাপা আবেগে ভরাট কথাগুলো যেন গমগম করে কানে ঢুকতে লাগল।—আমার মধ্যেও একটা ক্ষুধার্ত শিল্প-শিখা জ্বলছে, প্রকাশের পথ না পেয়ে সে আমাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে—কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে তোমাকে পেলে আমি এখনো অনেক—অনেক যুদ্ধ করতে পারব। নিজে আলোয় ফিরব, তোমাকে ফেরাব—তুমি রাজি হবে? তুমি আসবে?

রমার পা দুটো কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হল লোকটা এক্ষুনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওকে কাছে টেনে নেবে, আর তারপরে ওর কোনো শক্তি থাকবে না।

—বলো! যা-হোক বলো—রাজি হবে? আসবে? তোমার বাবাকে বলব?

—না না না! একটা অন্তিম মুহূর্তে যেন নিজেকে উদ্ধার করে রমা দরজা ঠেলে ছিটকে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর সোজা নিজের ঘরে, নিজের শয্যায়। সর্ব অঙ্গ কাঁপছে, বুকের ভিতরে ঢিপ ঢিপ করছে।

পরদিন।

খুব ভোরে বাবার গলা কানে আসতে ধড়মড় করে উঠে বসল। বাবা বাদলের সঙ্গে কথা কইছেন, ওটা একটা আস্ত পাগল, কোন্‌ রাত থাকতে উঠেই হয়তো দরজা হাঁ-করা খোলা রেখে চলে গেছে।

রমার মনে হয়েছে যে চলে গেছে আর সে কোনদিন এ-মুখো

হবে না। হয়নি···। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসে রমা লোকটার জন্য দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু তার থেকে স্বস্তিবোধ করেছে ঢের বেশি।···এর প্রধান কারণ হয়তো, আর একটি ছেলে ওর মনের দুয়ারের কাছাকাছি এসেছে এতদিনে! কিন্তু কেউ না এলেও দেবব্রতর আকৃতিতে সাড়া দেবার কথা ভাবলে অন্তরাত্মা বিমুখ হয়ে ওঠে।

ওই ঘটনার ঠিক দু'দিন বাদে আবার এক কাণ্ড।

পরের ভাই বাদল মিটিমিটি হেসে বলল, দিদি তোকে কারা বাইরে ডাকছে, ছাখ। রমা তখন রান্না নিয়ে ব্যস্ত, জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো। কিন্তু বাদল ততক্ষণে সামনের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে। এই পিঠো-পিঠি ভাইটা পাজীর পা-ঝাড়া। হাসি দেখেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল তার। বাইরের ঘরে এসে দেখে অপরিচিত কয়েকটি মূর্তি।

তাদের আবেদন শুনে রমা তো হাঁ। ভাগ্যিস বাবা নেই ঘরে। ওদের পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্য শুনে হাঁসফাঁস দশা। অ্যামেচার থিয়েটার পার্টির দল তারা। রমার অভিনয় দেখে এত মুগ্ধ যে তাদের দলে ওকে নেওয়া স্থিরই করে ফেলেছে। মেয়ে আর্টিস্টদের টাকাও কিছু কিছু দেওয়া হয়—কোনো ওজর-আপত্তি তারা শুনবে না, এবং ভবিষ্যতে রমা মিত্র যে অভিনয় জগতে একটি উজ্জ্বল নাম হয়ে উঠবে তাতে তাদের এতটুকু সন্দেহ নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রমা বাবার কথা আর পরীক্ষার কথা বলে কোনরকমে তাড়িয়েছে তাদের, তারপর জ্বলতে জ্বলতে বাদলের সামনে এসেছে। এই! কারা এসেছিল তুই জানতিস না?

এই ভাইটার ধরন-ধারন সবদাই নির্লিপ্ত, কোনো কারণে উত্তেজিত হওয়া ওর ধাতে নেই।—জানব না কেন দু'দিন ধরেই তো ঘুর ঘুর করছে, কাল আবার আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে দোকানে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে চপ কাটলেট খাওয়ালো—আর সমস্তক্ষণ কি করে তোকে থিয়েটারে টানা যায় সেই কথা জিজ্ঞাসা করল। বাধ্য হয়ে তোর সঙ্গেই দেখা করতে বলে দিলাম।

ভাই যে তখন বি.এ. পড়ে রাগ হলে রমার সে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বাদল তখন একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে ছিল, তার সামনের দেয়ালে-ঠেকানো টেবিলে খোলা বই। রমা চুলের মুঠি ধরে চেয়ারে আধখানা শুইয়ে ফেলে ঠাস ঠাস দুই চড় বসিয়ে দিল মাথার পিছনে। —বাঁদর ছেলে, বাবা আসুক, বলে দিচ্ছি।

অসহায় মুখ করে ভাই বলল, বাবাকে বলবি তো নিজের হাতে শাসন করিস কেন? যত্ন-আত্তি করে এতগুলো চপ কাটলেট খাওয়ালো, কিছু একটা তো পরামর্শ দিতে হবে। তাও আমি তো ওদের বলেই-ছিলাম, দিদি আসবে-টাসবে না, আমাকে পছন্দ হয় তো বিবেচনা করে দেখতে পারেন!

রাগের মুখেও রমা হেসেই ফেলেছিল।

যাক, থিয়েটার করাটা জীবনের ক্ষেত্র নয়—তখন পর্যন্ত অন্তত নিছক শখের নেশা এটা। কেউ প্রশংসা করলে খুশি হয়, আনন্দ হয়—এই পর্যন্ত। অন্য সব ক্ষেত্রেই রমা মিত্র নিজেকে অতি সাধারণের ঊর্ধ্বে ভাবত না কখনো। ফলে তার এই সাধারণ চালচলনের মাধুর্য-টুকুই কারো কারো চোখে পড়ত, মনেও বোধহয় ধরত।

...বিশেষ করে চোখে পড়েছিল আর মনে ধরেছিল প্রশান্ত ঘোষের। সেও রমার এম.এ. পড়ার সময়ে নয়, আরো দু'বছর আগে থেকে। রমা তখন বি. এ. পড়ে।

তারপর এই দু'বছরের মধ্যে প্রেমে পড়া এমন কি তার পরিণতিও অনেকটা ছকে বাঁধা মামুলি ব্যাপারে। হাজার গণ্ডা ছেলে মেয়ে হামেশাই এ-রকম প্রেমে পড়ে থাকে। মিলন অথবা বিচ্ছেদের পরিণামেও সচরাচর সে-রকম কিছু বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না। কিন্তু যে ছেলেটা আর যে মেয়েটা সেই মামুলি প্রেমে পড়ে, তাদের চোখেই শুধু তখন দুনিয়ার রং আলাদা। সেই রঙে তারা বিভোর হয়ে থাকে, পরস্পরকে দেখে আর মুগ্ধ হয়।

রমা যখন বি.এ. পড়ে প্রথম পরিচয়টা তখন। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা তেমন দ্রুত তালে বেড়ে ওঠার সুযোগ বা অবকাশ ছিল না।

পরিচয়ের রাস্তাটাও প্রায় চিরাচরিত এবং সাজানো। রমার প্রিয় বন্ধু এবং সহপাঠিনী সুমিতার মাসতুতো দাদা প্রশান্ত ঘোষ। এই দিনের দু'পাঁচ বছরের বড় মাসতুতো দাদারা আর যাই হোক গার্জেন গোছের হয়ে বসে না। সুমিতাদের বাড়িতেই দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ ওই ছেলের সঙ্গে। প্রশান্ত তখন এনজিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। অবকাশ কম। কিন্তু ছুটিছাটায় বাড়ি এলে প্রায়ই তাকে সুমিতার ওখানে দেখা যায়। সুমিতাদের বাড়ির কাছেই রমারা থাকে। বিকেলে দুই সহচরীর প্রত্যহ দেখা হয়—কলেজে তো হয়ই।

একদিন সুমিতাই তার প্রশান্তদার ঘনঘন মাসির বাড়ি আসার কারণটা রমার কাছে ফাঁস করে দিল। বলল, এই, প্রশান্তদা কলকাতায় এলেই আমাদের বাড়িতে এত আসে কেন জানিস?

রমা বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল, কেন?

—তোর জন্য।

—আমার জন্য মানে?

—তোকে ভালো লাগে তাই!

সেই প্রথম রমা দু'চোখ বড় বড় করে শুনল বড় লোকের এক স্কলারশিপ পাওয়া ছেলের তাকে ভালো লাগে, আর সেই জন্যে তার মাসির বাড়িতে সে ঘনঘন আসে।

সুমিতাকে···আবার লজ্জা কি। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি করে বুঝলি?···বলেছে?

সুমিতা পাকা মেয়ের মতো জবাব দিল, একেবারে স্পষ্ট করে, জোর গলায় বলেছে—শুধু আমি কেন, আরো কেউ শুনেছে।

রমা ঘাবড়ে গেল।—সে কি রে? পাগল নাকি তোর প্রশান্তদা, কি বলেছে?

—সুমিতা ভুরু কুঁচকে খানিক চেয়ে রইল ওর দিকে, তারপর হঠাৎ দুই বাহু সামনের দিকে প্রসারিত করে ফেলল।—বলেছে, 'ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে দুলছে আমার প্রাণ—ও আমার সর্বনাশ, ও আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ—আমার সমস্ত অপমানের

চূড়ায় তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন—আমার লজ্জা দিয়ে ভয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে।'

চণ্ডালিকা নাটকে নায়িকার শেষের দিকের উক্তি—বি.এ. ক্লাসের প্রথম বছরের মাঝামাঝি যে অভিনয়টা হয়ে গেল, রমার তাতে বেশ নাম হয়েছিল, মেডেলও পেয়েছিল। তখন নাচতেও পারত ভালো। হুবহু ওর অভিনয়টুকুই শুনিয়ে দিল সুমিতা।

লজ্জা পেয়ে রমা বলল, দেব তোকে ধরে এক থাপ্পড়—

—মাইরি বলছি, বান্ধবীকে বিশ্বাস করানোর আগ্রহ তারও কম নয়।—সেদিন তুই চলে যাবার পর তোর প্রশংসা করতে করতে প্রশান্তদা দিব্বি তোর অ্যাকটিংটা করে ফেললে! আর বললে, এত সুন্দর হয়েছে যে একবার শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে কথাগুলো!

রমার মুখে লালচে ছোপ পড়েছে, রং পরিষ্কার হলে সেটা আরো বেশি ধরা পড়ত। ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করল, এর থেকে প্রমাণ হল আমাকে ভালো লাগে?

—হল তো। আমি এরপর চেপেচুপে ধরলাম প্রশান্তদাকে, ঢোঁক গিলে তখন প্রায় স্বীকারই করে ফেলল!

স্কুল-কলেজে থিয়েটার করে মেডেল পেয়েছে, প্রশংসা পেয়েছে—কিন্তু কোনো ছেলের মনে এই গোছের ছাপ ফেলতে পেরেছে সেটা কল্পনাও করেনি। এর পর থেকে বলা বাহুল্য সুমিতার প্রশান্তদাকে সে একটু বিশেষ দৃষ্টিতেই দেখতে লাগল।

…বি.এ. ফাইন্যাল ইয়ারে কলেজের শেষ থিয়েটার করেছে চিত্রাঙ্গদা। তার অভিনয় জীবনের সেটাই স্মরণীয় দিন। সকলকে মুগ্ধ করেছিল, নিজেও মুগ্ধ হয়েছিল। আশ্চর্য, মনের দিক থেকেও সেই এক রাতে ও যেন সত্যিই রাজেন্দ্রনন্দিনী হয়ে উঠেছিল। অথচ এই অভিনয়ে গোড়ায় ওর আপত্তি ছিল, এমন কিছু কথা আছে এতে যা কলেজে-পড়া কুমারী মেয়ের মুখ দিয়ে বার করা শক্ত। সেই সব কথা কাট-ছাঁট করে তবে ওকে অভিনয়ে রাজি করানো গেছল।

অভিনয়ের তিন দিন আগে সুমিতা বলল, এই প্রশান্তদা হস্টেলে

ভাঁওতা দিয়ে চলে আসবে বলেছে যদি তুই একেবারে প্রথম রো-তে পাস-এর ব্যবস্থা করিস।

এই রকমই একটা কিছু শুনবে আশা করেছিল রমা। শোনার পর ছদ্ম ভ্রূকুটি করল, কেন, তুই দিতে পারিস না?

সুমিতা ঢং করে জবাব দিল, আমি খুব পারি, কিন্তু আমি দিলে হেজি-পেঁজির দলে গিয়ে বসতে হবে—তুই হলি গিয়ে নায়িকা রাজেন্দ্রনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা, তোর পাসের দামই আলাদা।

রমা এমন ভাব করেছিল যেন কেউ এলো বা না এলো তার বয়েই গেল। কিন্তু পরদিনই একেবারে প্রথম সারির একখানা পাস গুঁজে দিয়েছিল সুমিতার হাতে। অভিনয় শুরু হবার আগে পুরু চশমা-পরা ছেলেটাকে লক্ষ্য করেছে।

…যাক, কি অভিনয় করেছিল সেদিন সকলেই জানে। ও-ছেলের ভালো লাগবে সে আর বেশি কি। সেই ভালো-লাগা মূর্তি পরেও দেখেছে, আর আনন্দে নিজের মনে হেসেছে রমা। সত্যি ধন্য-ধন্য পড়ে গেছল। স্টেজে উঠে কম করে পাঁচজন মেডেল ডিক্লেয়ার করে গেছল ওর নামে। …আর সেই শেষের সীনএ ওর কথা শেষ হওয়া মাত্র হাততালি তো আর থামেই না। হ্যাঁ সেই সময়টুকুর জন্য রমা নিজেই ভুলে গেছল ও রাজেন্দ্রনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা নয়, কলকাতার দু'ঘরের বাসিন্দা এক কমার্সিয়াল আর্টিস্টের অতি সাধারণ মেয়ে রমা মিত্র।…তার আচরণে, মাধুর্যে, দৃপ্তভঙ্গীতে, রমণীসত্তার নিভৃতের শাশ্বত বাণী যেন ঘোষণা করেছিল সে অর্জুনকে বিদায় দেবার আগের মুহূর্তে:

'আমি চিত্রাঙ্গদা
দেবী নহি, আমি নহি সামান্যা রমণী।
পূজা করি
রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নহি, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ

মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তায়
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।...আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী।'

আর কারো খবর রাখে না, সুমিতার প্রশান্তদার মনে যে কি-রকম ছাপ ফেলতে পেরেছিল সেটা পরদিনই টের পেয়েছে।

সকালের দিকে সুমিতা বাড়ি এসে হাজির। বাবা ও-ঘরে বসে কাজ করছেন, এ-ঘরে বাদল আর কাজল বই নিয়ে বসেছে। রমা সাধারণত সকালের রান্নার ফাঁকে ফাঁকে নিজের পড়া সেরে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু গত রাতের ধকলের ফলে আজ বই নিয়ে বসা দূরে থাক, রাঁধতেও ভালো লাগছিল না। গত রাতের অভিনয়ের সাফল্যের একটা মিষ্টি রেশ ওর মনের তারে ঘোরাফেরা করছিল। আর বহু মুগ্ধ দর্শকের মধ্যে একখানা মাত্র পুরু চশমা-পরা মুখ বার বার চোখে ভাসছিল। আর থেকে থেকে ওর কেমন হাসি পাচ্ছিল। না, কাল রাতে ওর অভিনয় নিয়ে সুমিতার প্রশান্তদার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও ওই ছেলে কোনো কথা বলতে পারত কিনা সন্দেহ। সমস্ত কথা একটা ভাবের আবেগে জমাট বেঁধে থাকত হয়তো।

এর মধ্যে সুমিতা এসে দাঁড়াতেই রমা যেমন খুশি তেমনি বিড়ম্বিত। শোনাবার মতো কথা না থাকলে সুমিতা এই সকালে ছুটে আসত না। রান্নার এই চিলতে জায়গাটুকু গরমে তেতে আছে। আর এখানে বসে ফিসফিস করে কথা বললেও ওই বাঁদর দুটো ঠিক কান খাড়া করে রেখে শুনতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু সুমিতা বসতেও আসেনি আর গল্প করতেও আসেনি যেন। ওর মুখখানা কেমন শুকনো আর চিন্তাচ্ছন্ন মনে হল। চাপা গলায় রমাকে বলল, বাইরে আয়, কথা আছে।

রমা ঘাবড়েই গেল কেমন। ডালের কড়াটা নামিয়ে রেখে হাত ধুয়ে শাড়ির আঁচলেই হাত মুছতে মুছতে বাইরে এলো। বাদল-কাজল মুখ তুলে দেখল একবার। বাবা খেয়ালও করলেন না।

বাইরে পা দিয়ে ঘরের হাত পাঁচেক দূরে দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সুমিতা খবর দিল, প্রশান্তদা হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক অসুখ বাঁধিয়ে বসেছে, সেই সকালবেলা মেসোমশাই টেলিফোন করেছিলেন—পুলিসে চাকরি করতেন তো, আমাকে ধরেই সতের রকমের জেরা, কাল ছেলে কোথায় গেছল, কোনো রেস্টুরেন্টে কিছু খেয়েছে-টেয়েছে কিনা—এই সব।

সুমিতার প্রশান্তদার সঙ্গে মনের ব্যাপার নিয়ে অথবা রঙের ব্যাপারটা তখনো এমন পর্যায় এসে পৌঁছায়নি যে শোনামাত্র রমা পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠবে। সেটা অনুরাগের সঠিক সূচনার অধ্যায়ও নয় হয়তো। তবু শোনামাত্র মনটা খারাপ হয়ে গেল রমার। উতলা মুখে জিজ্ঞাসা করল, পেটের খুব গণ্ডগোল-টণ্ডগোল নাকি?

সুমিতা জবাব দিল, কি-যে প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেনি। রাতে বাড়িতে গিয়ে মাসিমা মানে তার মা-কে বলেছে, শরীরটা ভয়ানক খারাপ লাগছে—কিছু খাবে না। মাসিমা আর জোর করেননি, পেটুক ছেলের বাইরে খাওয়ার অভ্যাস আছে জানেন, মেসোমশাই শুনলে রাগারাগি করবেন ভেবে তাঁকেও কিছু বলেননি। একেবারে ভোর-বেলা সকলের চক্ষুস্থির। যন্ত্রণায় ছেলে প্রায় পাগলের মতো ছট-ফট করছে, বেঁকে-কুঁকড়ে যাচ্ছে, নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ছে—মাথার পিছনে কেউ নাকি সারাক্ষণ হাতুড়ির ঘা বসাচ্ছে, অজ্ঞান হবার দাখিল একেবারে।

অসুখটা কি না বুঝে উতলা মুখে রমা সুমিতার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সুমিতা বলে গেল, খাওয়া-দাওয়ার গণ্ডগোলে ও-রকম হল কিনা বুঝে মেসোমশাই খুব ভোরে ওকে ফোন করেছিলেন। এর ঘণ্টাখানেক বাদে সুমিতা ফোনে খবর নিয়েছে। একে একে দু'জন ডাক্তার প্রশান্তদাকে দেখে গেছে ততক্ষণে। তারাও ভালো করে

কিছু বুঝতে পারেনি। শেষের ডাক্তার কড়া ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে তখনকার মতো। আর বড় ডাক্তার দিয়ে চোখ পরীক্ষা করানোর কথা বলে গেছে। কারণ, প্রশান্তদার চোখ বরাবরই খারাপ আর যন্ত্রণাটাও চোখের দিক থেকে মাথার পিছনের দিকে যাচ্ছে আসছে।

…কিন্তু না, সুমিতা শুধু এই খবরটা দেবাব জন্যেই এই সকালে ওর কাছে ছুটে আসেনি। আরো খবর আছে। যথা, প্রশান্তদাই একটু আগে সুমিতাকে টেলিফোন করেছিল, একটা ছেড়ে দু'দুটো কড়া ঘুমের বড়ি খেয়েও এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। আর, এর মধ্যে আরো দু'বার ওই মাথার যন্ত্রণাটা উঠেছিল। মস্ত একজন চোখের ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে—সেই ডাক্তার তাকে আগেও অনেকবার দেখেছে, তাই তাকেই প্রথমে দেখানো ঠিক হয়েছে। এ-দিকে অর্থাৎ এই দক্ষিণ কলকাতাতেই সেই বড় চোখের ডাক্তারের চেম্বার। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তার বাবা সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজেই তিনি হাই প্রেসারের রোগী, তাছাড়া তাঁরও শরীর ভালো নয়। সুমিতার প্রশান্তদা তাই বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে রাজি হয়নি—বিকেল ঠিক সোয়া-পাঁচটায় ট্যাক্সি নিয়ে সুমিতার বাড়ি আসছে, সুমিতাকে তুলে নিয়ে সেখান থেকে চোখের বড় ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে—সঙ্গে একজন পুরনো চাকর থাকবে, তবু সুমিতা সঙ্গে থাকলে তার বাবা-মায়ের ভাবনা থাকবে না। প্রশান্তদাকে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবার পর সুমিতার ছুটি.

খবর এখানে শেষ হলেও সুমিতার এই সকালে বাড়িতে ছুটে আসার কথা নয়। কিন্তু সে-কথা রমার মনে হল না। চিন্তিত মুখে বলল, দেখিয়ে আন, কি হল আবার চোখের…

—তুই সঙ্গে যাবি?

—আমি! আমি কি করে যাব?

—কেন, ট্যাক্সি করে, আমার সঙ্গে।

—যাঃ, সকলে কি ভাববে।

—সকলে জানছে কি করে, তুই ঘড়ি ধরে ঠিক সোয়া-পাঁচটায় এই রাস্তার মোড়ে দাঁড়াবি, আমরা তুলে নেব।

—না-না, বড় বিচ্ছিরি, তাছাড়া চাকরটা সঙ্গে থাকবে।

—আজ্ঞে না, আমাদের বাড়ি পৌঁছেই চাকরটাকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে বিদায় করা হবে—তবে আমি থাকলে যদি অসুবিধে হয় তো একলা গিয়েই প্রশান্তদাকে দেখিয়ে নিয়ে আয়।

রমা বিরক্তির সুরে বলল, অসুখ-বিসুখের মধ্যেও তোর ঠাট্টা··· তুই গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আয়, আমি সন্ধ্যার পর তোর কাছ থেকে খবর নেব'খন!

এইবার সুমিতার বিরক্তি।—আমি আগেই জানি তুই এ-রকম বলবি, যাক গে, আমি এক্ষুনি প্রশান্তদাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি তুই যাবি না।···অত করে বলল, তাই ছুটে এসেছিলাম—

···অত করে বলল! কে?

—কে আবার, অত যন্ত্রণার মধ্যেও নাকি তোর কাল রাতের অ্যাকটিং মাথার মধ্যে গিসগিস করছে।···তুই ভয়ানক ভাববি বলে প্রশান্তদার সব কথা তোকে বলিনি···টেলিফোনে কি বললে জানিস? তার ধারণা শিগগিরীই অন্ধ হয়ে যাবে, তার জানা-শোনার মধ্যে এ-রকম আরো কার হয়েছে—মাথার পিছনে ঠিক সেই রকমই হঠাৎ হঠাৎ মারাত্মক ব্যথা। বলল, রমার আর কোনো থিয়েটার আমার দেখা হবে কিনা কে জানে···বার বার করে অনুরোধ করল তোকেও সঙ্গে নেবার জন্য। সুমিতা এবারে মিনতির সুরে বলল, সেন্টিমেন্টাল লোক, না গেলে খুব দুঃখ পাবে, চল্ না···তাছাড়া কতক্ষণ লাগবে ডাক্তারের পরীক্ষা করতে কে জানে, আমাকে একলা হাঁ করে বসে থাকতে হবে।

অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে রমার একটুও সময় লাগল না। বলল, আচ্ছা যাব—ঠিক সোয়া-পাঁচটায় ওই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

সুমিতা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। সমস্তটা দিন একটা অজানা

আশঙ্কা নিয়ে কাটালো রমা। একটা লোকের চোখ যেতে বসেছে শুনলে কেমন লাগে।

সোয়া-পাঁচটার একটু আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু তারপরেই বিরক্তির একশেষ। ও-ধারের একটা বাড়ির এক তলার দাওয়ায় বসে জনাতিনেক সাঙ্গো-পাঙ্গোর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে ছোট ভাই কাজল। এ-ভাইটাও শয়তান এক-নম্বরের, কিন্তু বাদলের মতো নয়। বাদল যতো পাজীই হোক, মুখে বেশি কথা নেই, সঙ্গী-সাথীও বেশি নেই—কথা বেশি বলে না, যেটুকু বলে হুল ফুটিয়ে বলে। কিন্তু কাজলটা এক নম্বরের আড্ডাবাজ, মাত্র হায়ার সেকেণ্ডারির শেষ ধাপে পৌঁছেছে, এরই মধ্যে বাইরে থাকতে পেলে আর ঘরে ঢুকতে চায় না। দিদি এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর আর সঙ্গীদের চোখ এদিকে ধাওয়া করেছে।

রমার রাগ হচ্ছে, সেই সঙ্গে ফাঁপরেও পড়েছে। এ-ভাবে ওদের চোখের সামনে ট্যাক্সিতে ওঠে কেমন করে। যে-সব পাজী ছেলে আজকালকার, হয়তো এই নিয়েই হাসাহাসি করবে নিজেদের মধ্যে। তাছাড়া নিজেরও সঙ্কোচ, কাজলের অনেক বড় দিদি সে।

গম্ভীর মুখে ভাইয়ের দিকে তাকালো। কাজল দল ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলো! নিরীহ মূর্তি।—এখানে দাঁড়ালি যে?

—এক জায়গায় যেতে হবে, তুই লোকের বাড়ির দাওয়ায় বসে অত আড্ডা দিস কেন—বাড়ি যা।

অনুশাসনে কান দিল না, মুচকি হেসে কাজল জিজ্ঞাসা করল, সকালে সুমিদি এসেছিল—সিনেমার প্রোগ্রাম বুঝি।

রমা আরো গম্ভীর। কিন্তু কৈফিয়ত দাখিল করার সুযোগ পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু স্বস্তি বোধ করল।—সুমিতাকে নিয়ে চোখের একজন বড় ডাক্তারের কাছে যাব।

…ও। বড় চোখের ডাক্তার কাকে দেখানো হবে কাজলের সে কৌতূহল নেই। বলল, তোকে দেখে ওদের একটু চা খাওয়ার ইচ্ছে হল…দিদি চারজনে ষাট পয়সা লাগবে—আছে?

বিরক্তমুখ করে রমা ছোট্ট ব্যাগ থেকে একটা টাকাই বার করে ভাইয়ের হাতে দিল।—যা, ভাগ্—আর কোনদিন চাইলে গাঁট্টা খাবি।

হিসেবি দিদিকে এত দরাজ হতে কাজল বিশেষ দেখেনি। বাবার দেওয়া সামান্য টাকায় অনেক মাথা ঘামিয়ে দিদিকে সংসার চালাতে হয়। কাজল মনের আনন্দে টাকা নিয়ে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরাও দাওয়া ছেড়ে উঠল।

রমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। মিনিটখানেকের মধ্যে পাশ ঘেঁষে ট্যাক্সি দাঁড়াল। কোণে পুরু কালো গগল্‌স-পরা সুমিতার প্রশান্তদা, পিছনের কুশনে মাথা রেখে আধ-শোয়া। তার পাশে সুমিতা, এ-পাশটা রমার জন্য খালি। রমা উঠতে যেতে সুমিতার কথায় বাধা পেল। ও প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করছে, এখন কেমন লাগছে বলো, রমার কোনো ভাই-টাইকে সঙ্গে নিয়ে নেব?

ব্যস্ত মুখে প্রশান্ত সোজা হয়ে বসল।—না কিছু দরকার নেই, এখন ভালই লাগছে—রমা উঠে পড়ো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রমা উঠে সুমিতার পাশে বসল। পুরু কালো চশমায় চোখ ঢাকা, ভালো বোঝা যায় না, তবু এই মুহূর্তে খুব একটা কষ্ট পাচ্ছে বলে মনে হল না। ঠোঁটের ফাঁকে ছেলেমানুষি মিষ্টি হাসি একটু—যে-রকম দেখে অভ্যস্ত রমা।

সুমিতাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

সুমিতা জবাব দিল, আমাদের বাড়ি এসেও আবার ব্যথার মতো হয়েছিল, আমার বাপু ভয় করছে।

প্রশান্ত হাসল, তোর আবার বেশি ভয়।...এ ঘোড়ার ডিমের কালো চশমাটা খুলে সাদা চশমা পরব?...পাওয়ার নেই, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—না না, সুমিতা ব্যস্ত হয়ে উঠল, দেখার কি আছে, চোখে আলো লাগিয়ে শেষে একটা ক্ষতি হয়ে যাক। চিন্তা সত্ত্বেও সুমিতা না হেসে পারল না। রমাকে বলল, একজন ব্যাটাছেলে সঙ্গে থাকলে ভালো হত, কিন্তু কিছুতে নেবে না, আসলে তোর সঙ্গে একলা.

যাবার সাধ—বুঝলি ?···উঃ !

রমা বেশ জোরেই একটা চিমটি কেটে বসেছে। অসুখবিসুখের ব্যাপারের মধ্যে এ-সব কথা ভালও লাগছিল না।

কি হল না বুঝে প্রশান্ত ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

কথার ফাঁকে ট্যাক্সি কোন পথে চলেছে রমা বা সুমিতা কেউ খেয়াল করেনি। এবারে সুমিতা বলে উঠল, ও মা, চৌরঙ্গীর দিকে চলেছি যে, ডাক্তারের চেম্বার সাউথে বলেছিলে যে ?

প্রশান্ত আবার পিছনে মাথা এলিয়ে জবাব দিল, সাউথে ঠিক নয়···সেন্ট্রালে।

সুমিতা অবাক একটু। তারপর বলে উঠল, এত অসুখের মধ্যেও কেমন দুষ্টুমি দেখেছিস ! দাঁড়াও, মেসোমশাইকে গিয়ে বলছি আমি—

জবাব না দিয়ে প্রশান্ত মিটিমিটি হাসছে। ওই ছেলেমানুষি হাসিটা সুন্দর নয় এ কেউ বলতে পারবে না ! রমারও হাসি পাচ্ছে আবার একটু অস্বস্তিও বোধ করছে।

কিন্তু ওদের আকাশ থেকে পড়া বাকি তখনো। কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় যেতে হবে ট্যাক্সিওলার জানাই আছে যেন। যে রাস্তায় এসে থামল তার একদিকে গঙ্গা, অন্য দিকে আধা নির্জন ফাঁকা মাঠ। গঙ্গার ধারে অবশ্য লোকজনের ভিড় খুব।

ওদের হতভম্ব মূর্তির দিকে না চেয়ে প্রশান্ত পকেট থেকে সাদা চশমার কেস্ বার করে কালো চশমা খুলে সেটা পরল। কালো চশমা পকেটে চালান দিল। দরজা খুলে নেমে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে মিটার দেখে ট্যাক্সির ভাড়া মেটালো। তারপর মুখখানা খুব গম্ভীর করে সুমিতাকে তাড়া দিল, কই, নেমে পড় না—

সুমিতার বিমূঢ় মূর্তি তখনো।—এখানে নামব মানে—ক'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট তোমার ?

—সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে—নামো তাড়াতাড়ি, মাথাটা ঝিমঝিম করছে কেমন, একটু হাওয়ায় বসি—

ওরা নেমে পড়তে ট্যাক্সিও চলে গেল। প্রশান্তর ঠোঁটের ফাঁকে

দুষ্টুদুষ্টু হাসি দেখে রমার খটকা লাগছে কেমন। পুরু সাদা চশমায় মুখখানা অন্যরকম দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু সুমিতার মাথায় দায়িত্ব, ও গজগজ করে উঠল, একধার থেকে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছ, কি-যে কাণ্ড তোমার বুঝি না, মাথা ঝিমঝিম করছে তো ওটা পরে চোখে আলো লাগাচ্ছ কেন? শেষে একটা বিপদে ফেলবে আমাদের!

—আয়, বলছি।

রাস্তা পেরিয়ে আগে খানিকটা মাঠ ভেঙে প্রশান্ত একটা ফাঁকা জায়গায় বসল। পিছনে ওরা দু'জন।

হাত দিয়ে মাটি চাপড়ে গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলল, বোস্—বোসো রমা। ওরা বসতে সুমিতার দিকে ফিরল। বলল, কালো চশমা খুলে ফেললাম কারণ আমার ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে—এখন পুরোপুরি অন্ধ আমি সেটা কেউ জানে না।

রমা চমকে তাকলো। সুমিতা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল প্রায়, কি বকছ যা তা?

…ঠিকই বলছি। ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টুদুষ্টু মিষ্টিমিষ্টি হাসি। পুরু সাদা চশমার ওধারে চোখ দুটো থেকেও যেন সেই হাসি ছিটকোচ্ছে।—কাল রাত থেকেই অন্ধ আমি, চোখে শুধু চিত্রাঙ্গদা দেখছি, আর কিছুই দেখছি না।

রমার শ্যামবর্ণ মুখে যেন ঝলকে ঝলকে রক্ত জমাট বাঁধতে থাকল। সুমিতার তাজ্জব মূর্তি।— আর তোমার অত মাথার যন্ত্রণা—চোখের ডাক্তার?

নিজের এই ভাঁওতাবাজীর কৃতিত্বে প্রশান্ত পরম পুলকিত। জবাব দিল, যন্ত্রণা চোখের কি কোথাকার কে জানে—আর চোখের ডাক্তার ঠিকই আছে, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি বিকেল পাঁচটার মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরেই এসেছি—বলেছি মাথায় একটু একটু যন্ত্রণা হয় পাওয়ার বাড়ল কি কমল দেখুন। ডাক্তার আজ আর কাল অ্যাট্রপিন লাগিয়ে পরশু যেতে বলেছে—সেদিন যদি নতুন পাওয়ার দেয়ও চশমা বানাতে আরো দু'তিন দিন লেগে যাবে—সে

চশমা পরি না পরি নতুন পাওয়ার একটা বাগাতেই হবে, মোট-কথা এখন চার পাঁচ দিনের ছুটি আমার।

এদের দু'জনের মুখে কথা সরে না। সুমিতা রাগবে কি হাসবে ভেবে পেল না। রমার সঙিন অবস্থা। তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে পিটপিট করে তাকিয়ে প্রশান্ত আবার বলল, দেখো, আমাকে তুমি খুব খারাপ লোক ভাবছ, কিন্তু যা করেছি সব প্রাণের দায়ে—রাতে ওই চিত্রাঙ্গদা দেখে সকালে যদি এনজিনিয়ারিং কলেজে ছুটতে হত ব্যথা যে কোথা থেকে কোথায় ছোটাছুটি করত বলা যায় না, সত্যিকারের অ্যাকসিডেন্টই হয়তো কিছু বাঁধিয়ে বসতুম—আর এত সব খারাপ কাজের জন্য একমাত্র দায়ী তুমি—মানে চিত্রাঙ্গদা—জিভের তলায় দু'দুটো কড়া ঘুমের বড়ি রেখে শুধু জল গিলে সক্কলকে ঠকাতে হয়েছে পর্যন্ত।

কি একটা অনুভূতি যেন রমার সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরছে। ভিতরে ভিতরে এক ধরনের কাঁপুনি শুরু হয়েছে তার। এতক্ষণে সুমিতা হেসে সারা, জোরে একটা ধাক্কা মেরে রমাকে আধখানা শুইয়ে দিল প্রায়।—তোর জন্যে এত কাণ্ড, তাহলে আমি এখানে কেন—আমি যাই।

ধাক্কা সামলে রমা সজোরে তার পিঠে একটা চড় বসালো প্রথম, তারপর আর একটু গা ঘেঁষে বসে ওকে ধরে রাখল।

সুমিতা এবারে প্রশান্তর দিকে চোখ পাকালো।—আমি ছেড়ে দেব ভাবছ, বাড়িতে সব ফাঁস করে দেব না।

প্রশান্ত নিরুদ্‌বেগ।—দিয়ে দেখ্ না—জুতো-পেটা করে বাবা বাড়ি থেকে বার করে দেবে, আর নিজেই তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে বসবি। হাসিমাখা দৃষ্টিটা রমার দিকে ঘুরল, আমার পুলিশ বাপকে তো জানো না, অনেক পাপ করলে তবে অমন কড়া বাপ মেলে।

ওরা দু'জনেই হেসে উঠল। প্রশান্তর পরিতুষ্ট মুখ। সুমিতাকে বলল, এক রাতের মধ্যে মাথাখানা কি রকম খাটিয়েছি বল্—যাকে বলে নিখুঁত প্ল্যান।

সুমিতা মাথা নেড়ে জবাব দিল, এর মধ্যে ওই আমাকে টানাটাই যা একটু খুঁত—

প্রশান্ত স্বীকার করে না।—বুঝছিস না কেন, গোড়ায় গোড়ায় তোকে দরকার।

—কি? গোড়ায় গোড়ায়! এই উঠলাম আমি—

ছদ্ম কোপে উঠতে গেল। রমা জোর করে ধরে রাখল তাকে। অথচ সর্বাঙ্গ অবশ লাগছে কেমন, ওই কথাগুলোই যেন স্পর্শ হয়ে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে।

পাশ দিয়ে বাদামঅলা যাচ্ছিল একটা। তাকে ডেকে প্রশান্ত একরাশ বাদাম কিনল। নিজেই ভাগ করে ওদের দু'জনকে দিল আর নিজে নিল। রমার তখন মনে হচ্ছিল যেন স্কুলের ছেলে একটা।

বাদাম ভাঙতে ভাঙতে প্রশান্ত ওর দিকে চেয়ে বলল, মাথা খাটিয়ে এত কাণ্ড করলাম, তার পুরস্কার না নিয়ে ছাড়ছি না এখন।

মুখ তুলে তাকাবার জন্যেও রমার চেষ্টা করতে হল একটু। সুমিতা ফাজিল মেয়ের মতো দাবড়ানি দিয়ে উঠল, আমার সামনে?

—চিত্রাঙ্গদা।

—চিত্রাঙ্গদা মানে?

—মানে আর—একটিবার শুনব।

রমা অস্ফুট স্বরে বলল, এখন হবে না।

প্রশান্ত জোর দিয়ে বলল, হতেই হবে, না হলে ছাড়ছে কে—কানের তৃষ্ণা যে কি জিনিস, এতকাল জানাই ছিল না।

সুমিতা হাঁটুর ওপরে বড় করে চিমটি কেটে বসল একটা।—নে শুরু করে দে তা হলে। রমা জোরেই মাথা ঝাঁকালো এবার।—না, এখন হবে না।

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সত্যিই হল না। এমন কাণ্ড, যে রমার পাঁচটা লাইনও মনে আছে কিনা সন্দেহ। বার বার এক কথাই বলল, আর একদিন হবে, আজ পারছি না।

বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় আটটা। ওকে বাড়ির কাছে ছেড়ে

দিয়ে ট্যাক্সি সুমিতা আর প্রশান্তকে নিয়ে চলে গেল। রমার বুকের তলায় তখনো কাঁপুনি। ঘরে পা দিতেই বাবার মুখোমুখি।

—কি রে, এত দেরি যে তোর?

—একটু দেরি হয়ে গেল বাবা।

কোনরকমে পাশ কাটিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকল। ঘরের দুই কোণে বাদল আর কাজল বই নিয়ে বসেছে। দু'জনেই মুখ ফেরালো। ছদ্ম মনোযোগে কাজলের চোখ দুটো তক্ষুনি বইয়ের দিকে ঘুরল আবার। কিন্তু বই ফেলে বাদল ভাবলেশশূন্য চোখে চেয়েই রইল তার দিকে। ও-রকম করে তাকিয়ে লোককে অপ্রস্তুত করতে ওই পাজীটা ওস্তাদ। রমা তাড়াতাড়ি রান্নার জায়গায় চলে এসে বাঁচল।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে ঘরে ঢুকে দেখে বই খোলা ফেলে রেখে বাদল তেমনি চুপচাপ বসে আছে। আবার চোখাচোখি হতে আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, চোখের ডাক্তার তোদের এত রাত পর্যন্ত আটকে রাখল নাকি?

রমার রাগ হচ্ছে কিন্তু জবাব দেবে কি?

বাদল আবার জিজ্ঞাসা করল, চোখ কার খারাপ, তোর না সুমিতাদির?

জবাব না দিয়ে রমা এবারও রাগত চোখেই চেয়ে রইল শুধু।

বাদলের তেমনি নির্লিপ্ত মুখ। জবাব না পেলেও গায়ে ফোস্কা পড়ে না। সাদা-মাটা মুখে তৃতীয়বার প্রশ্ন ছুঁড়ল, ট্যাক্সির কালো চশমা-পরা ভদ্রলোক সুমিতাদির দাদা বুঝি?

দু'পা এগিয়ে এসে রমা এবারে ঝাঁঝিয়ে উঠল, বই সামনে খোলা ফেলে রেখে তোর এত খোঁজে দরকার কি? বেশি ফাজিল হয়েছিস, কেমন?

বাদলের আরো নিরীহ মুখ।—ও বাবা, রেগেই গেলি দেখি।

রমা অগ্নিদৃষ্টিতে ছোটভাই কাজলের দিকে তাকালো। পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ তার। দিদির কাছ থেকে একটা টাকা হাতানোর পরেও দূরে দাঁড়িয়ে সে সব লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়, তারপর তার দাদার

কানে তুলে দিয়েছে। রমার ইচ্ছে করল মুখের কাছ থেকে বই সরিয়ে নিয়ে ওর মাথায় দুটো গাঁট্টা বসিয়ে দেয়।

রাগ দেখিয়ে রান্নার জায়গায় চলে এলো আবার। আবার একটু বাদে নিজের মনেই হেসে সারা।

অসুখের অছিলায় পরপর চারদিনই কলকাতায় থেকে গেছে প্রশান্ত।

সুমিতা এসে রোজ দু'বেলা রমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেছে। ওদের দু'জনকে রেস্টুরেন্টে খাইয়েছে। আর বিকেলে মাঠে বসে ঝোলাঝুলি—চিত্রাঙ্গদার শেষের ওইটুকু শোনাতেই হবে।

শোনাতে হয়েছে। উপসংহারে রমা সুমিতার প্রশান্তদার দিকেই চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছে—

'আজ শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী!'

তারপর খিলখিল হাসি। আর তারপরেই বিষম লজ্জা।

পড়াশোনায় রমা সাদা-মাটা ছাত্রী, মোটামুটি পাশ-টাশ করে যায় এই পর্যন্ত। কিন্তু সুমিতার প্রশান্তদা শুনেছে স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে বোর্ডে ফিফ্‌থ হয়েছিল। এনজিনিয়ারিং-এও প্রতি বছর ফার্স্ট হচ্ছে। রমার মনে তাইতে একটু সংকোচ। কিন্তু পুরু কাচের ওধারে প্রশান্তর চোখ দুটো যখন ঘুরে ফিরে তার দিকেই আটকে থাকত আর ঠোঁটের ফাঁকে একটু দুষ্টুদুষ্টু হাসি লেগে থাকত—রমার তখন ছেলেমানুষই লাগত তাকে।

রমা যেবার বি. এ. পাশ করল, প্রশান্ত সেবার এনজিনিয়ারিং পাশ করে বেরুলো। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো মাইনের চাকরি। একে কৃতী ছেলে, তায় মুরুব্বির জোর আছে। প্রশান্তর বড়দাও আধা প্রবীণ এনজিনিয়ার, বম্বের এক নামজাদা ডিজাইন অ্যাণ্ড কনস্ট্রাকশন ফার্মএ মস্ত চাকরি করে। বাবা আর এই বড় ছেলের সুপারিশে ওই

এনজিনিয়ারিং কোম্পানির কলকাতার শাখায় বহাল হয়ে গেল সে। প্রশান্ত খুঁতখুঁত করেও বাপের হুকুম অমান্য করতে পারল না। তার ভয়ানক ইচ্ছে ছিল বিলেতে গিয়ে আরো কিছু ডিগ্রী-টিগ্রী পকেটস্থ হবার পর কর্মজীবন শুরু করে। কিন্তু বাপের ইচ্ছেটাই তাদের পরিবারে সব। তার বাবা মস্ত জবরদস্ত পুলিস অফিসার ছিলেন। অনেকদিন হল রিটায়ার করেছেন। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের পুলিসী মেজাজ এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। স্ত্রীর মুখে ছেলের খুঁতখুঁতানির কথা শুনে সেই বাপের হুকুম, দাদা যা ব্যবস্থা করেছে তাই করো—চাকরিতে ঢোকো।

ছেলে মুখ বুজে চাকরিতে ঢুকেছে।

চাকরিতে ঢোকার ফলে ছেলের মেজাজ খুশি নয় সেটা কেবল রমা টের পেয়েছে। কারণ বাড়ির আর কাউকে ছেলে বিশ্বাস করে না। মা-কেও না। তার মা নাকি নিজে কিছুই ভাবতে পারেন না, আর তার ফলে বাবার ওপরে পুরোপুরি নির্ভর। সমস্যার কোনো কথা কানে গেলেই তা বাবার কানে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। অতএব রমার কাছে মুক্ত কণ্ঠে বাপের সমালোচনা করে সে।—বাবার কেবল টাকা টাকা আর টাকা—টাকার গন্ধ পেলেই হল—কবে যে আমার সঙ্গে লেগে যাবে ঠিক নেই। সামনে ডেকে কিছু বলে যখন তখন কেমন একটা কাঁপুনি ধরে, নইলে—

রমা হেসে বাঁচে না।

এই ছেলের মুখেই শুনেছে, ওই বসত বাড়ি ছাড়াও কলকাতায় আরো দু'দুটো বাড়ি আছে তাদের। মোটা ভাড়া আসে সেখান থেকে। তাছাড়া ব্যাঙ্কেও তার বাবার এন্তার টাকা।—এ-সব কি চাকরি করে হয়েছে ভাবো নাকি? কতভাবে টাকা এসেছে বাবার পকেটে সেসব আমরা জেনেও না জানার ভান করে থাকি হুঁঃ, বাবাকে দেখেছি বলেই পুলিসের চাকরি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। উনি আমাকে কথায় কথায় সদুপদেশ দেন!

…প্রেমে কিছুটা হাবুডুবু অবস্থা তাদের তখন। আলাপ এবং

দেখাসাক্ষাৎ বেশ ঘনীভূত হয়েছে। আর তার ফলে ভালো লাগাটা এখন আর এক তরফা নয়—অর্থাৎ ভালো বেশ রমারও লাগছে। তাতেই বাবার সম্পর্কে এ-সব কথা শুনলে রমা সংকোচ বোধ করে। কিন্তু সুমিতার মুখে প্রশান্তদের বনেদী বাড়ির কর্তাটির দাপটের কথা যা শোনে তাতে রমার ভয়ই করে। তাঁর নাকি হিটলারি মেজাজ, মুখ দিয়ে একবার যে কথা বার করবেন তার আর নড়চড় নেই। তবু সেই ভদ্রলোক ছেলের বিলেত যাওয়া বন্ধ করল বলে রমা মনে মনে খুশিই হল। মুখে বলতে পারেনি, কিন্তু মনে মনে বলেছে, বেশ হয়েছে, বিলেত গিয়ে ছেলে একেবারে লাটসাহেব বনে আসবে।

প্রেমে ভরপুর হাবুডুবু অবস্থাটা দাঁড়াল রমার এম. এ. পড়ার দুটি বছরে। প্রায়ই আপিস পালিয়ে প্রশান্ত ছেলেমানুষের মতই য়ুনিভার্সিটির দোরগোড়ায় ওর ছুটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর সাইটএর কাজে বেরুলে আসা তো আরো সহজ। গোড়ায় গোড়ায় রমা লজ্জা পেত। ক্লাস সুদ্ধু ছেলেমেয়ে জেনে ফেলেছে। ফাঁক পেলে তারা ঠাট্টা-তামাসা করে। এক একদিন রমা রাগ দেখায়, তোমার কোনো আক্কেল যদি থাকত, সব কি ভাবছে বলো তো—

প্রশান্ত জবাব দেয়, নির্বোধ না হলে যা ভাবার ঠিক ভাবছে।

এ নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার মনে করে না।

কিন্তু শেষে রমার কাছেও এটা সহজ হয়ে গেল। উল্টে মনে মনে এই প্রতীক্ষাতেই থাকত।

গল্প করতে করতে দুজনে এসপ্লানেড পর্যন্ত হাঁটে। রেস্টুরেন্টে যায়। লোকের ভিড় আর চোখ এড়িয়ে মাঠে বেড়ায়। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা থামিয়ে রাখা যায় না। ফেরে। তারপর ট্রামে পাশাপাশি বসে সন্ধ্যের পরে বাড়ি। প্রশান্তর বাড়িতে জানে ছেলের কাজের চাপ, রমার বাড়িতে জানে মেয়ের লাইব্রেরিতে পড়ার চাপ। য়ুনিভার্সিটি আর আপিস পালিয়ে দুজনে সিনেমাও দেখে মাঝে মাঝে। অন্ধকার ঘরে প্রশান্ত নিঃশব্দে অনেক রকমের খুনসুটি করে। নিরুপায় রমা নীরবে শাসায় তাকে, হাত ঠেলে সরায়। বাইরে বেরিয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে,

আর কোনদিন যদি তোমার সঙ্গে আসি।

প্রশান্ত কেবল হাসে। সেই দুষ্টুমি মাখা হাসি।

এক-একসময় পরীক্ষার দুর্ভাবনাও মাথায় চেপে বসে। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচতে চলেছে। রমা বলে, তোমার জন্য আমি ঠিক ফেল করব, তখন লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না।

প্রশান্ত নিজে স্কলার, কিন্তু রমা ফেল করলেও তার তেমন দুর্ভাবনা নেই। ফেল করুক আর পাশ করুক রমা রমাই। তাচ্ছিল্য করে জবাব দেয়, হুঁঃ, ভারী তো বাংলা পড়া তার আবার ফেল।

রাগ দেখাতে গিয়েও কি মনে পড়তে রমা হেসে ফেলে।—কি বললে, ভারী তো বাংলা। বলতে লজ্জা করে না, বাংলায় একটা চিঠি লিখতে সাতটা বানান ভুল হয়, বই পড়ার সঙ্গে শাড়ি পরার বানানের তফাত জানে না!

এর মধ্যে দিন চারেকের জন্য দূরের সাইটএ কাটানোর পর রওনা হবার মুখেই সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম করে প্রশান্ত রমাকে চিঠি লিখেছিল, অমুক-রঙা শাড়িখানা পরে যেন আসে। তাইতেই বানানের বিভ্রাট।

কিন্তু প্রেম প্রীতির ব্যাপারটা জানাজানি হতে আর বেশি দেরি হল না। প্রশান্তর বাবা সঠিক হদিস পেলেন সুমিতাকে জেরা করে। সুমিতার মা-ই আভাসে কিছু বলেছিলেন তাঁকে। অবশ্য রমার স্বপক্ষেই ওকালতি করেছিলেন তিনি। মেয়েটা চমৎকার, আর ছেলেরও পছন্দ···বিয়ে দিতে আপত্তি কি। কার মেয়ে জানার পরে ছেলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তিনি। ওদিকে প্রশান্তর এক দাদার বিয়ে তখনো বাকি—সে সাধারণ চাকরি করে। তার বিয়েটা দিয়ে ফেলে কৃতী এনজিনিয়ার ছেলের জন্য অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আনার সংকল্প। তার মধ্যে এ-রকম ছেলেমানুষি বরদাস্ত করার মতো নরম মন নয় তাঁর। সুমিতার মায়ের কথা শুনে মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে পাঁচ কথা শোনালেন। শেষে ছেলেকে ডেকে বেশ কড়া সুরেই হুমকি দিলেন, বাপু হে, তোমার ছোড়দার বিয়েটা হয়ে

গেলে তোমার বিয়ে আমিই দেব। ততদিন ঠাণ্ডা মাথায় কাজের উন্নতি করো।

প্রশান্ত প্রথমে বাবার ঘর ছেড়ে আর তারপর বাড়ি ছেড়েই পালিয়ে বাঁচল তখনকার মতো। বাবার হুমকির খবরটা সেদিনই রমাকে দিল সে। এই গুণটা আছে, নিজের সমস্যাটা দু'জনের সমস্যা ভাবে। শোনামাত্র রমার দু'চোখ কপালে।—সর্বনাশ! তাহলে?

ঠোঁট উল্টে প্রশান্ত জবাব দিল, সর্বনাশ আবার কি, ও-সব পুলিসী দাপটে দেশের স্বাধীনতা ঠেকানো গেছে?

রমা এ-কথার পরেও খুব একটা আশ্বাস পেল না। বলল, দুটো এক হল! আর তাতেও তো কত লোকে জীবন দিয়েছে।

—আমিও তো একজনকে আমার জীবন দিয়েছি।

কি ভালো যে লেগেছিল শুনতে রমাই জানে। সেদিন সন্ধ্যার আড়ালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কোণের চত্বরে বসে দু'জনে যত কাছাকাছি হয়েছিল এর আগে ততটা আর কখনো হয়নি। বাড়ি ফেরার পর ভাই দুটো আর বাবার চোখের তফাতে থাকতে চেষ্টা করেছে।···সেই রাতে আয়নায় যতবার নিজের দিকে চোখ গেছে, মুখ লাল মনে হয়েছে।···রাতেও ভালো ঘুমুতে পারেনি। দুই অধরে সেই ঘন-তপ্ত আবেগের স্পর্শ সমস্ত রাত ধরে তার সর্বাঙ্গে আবেশ ছড়িয়েছে। আর বিহ্বল করেছে।···হ্যাঁ, রমার ভয়ই ধরেছিল শেষে। ওই বাইরেটাই যা শান্তশিষ্ট, ভেতরটা একবার আসকারা পেয়ে দস্যু একেবারে।

এই সময়েই প্রশান্তর বন্ধু অবনীশের সঙ্গে সুমিতার বিয়ে হয়ে গেল। সুমিতা দেখতে ভালো, তার বাবার পয়সাও আছে কিছু। প্রশান্ত তাদের ভালো চাকুরে ছেলের সন্ধান দিতে তারা সাগ্রহে এগিয়েছে। রমার সঙ্গে পরামর্শ করে ওদের মন বোঝাবুঝির ব্যাপারেও প্রশান্ত বেশ সাহায্য করেছে। সুমিতার পছন্দ হয়েছে অবনীশকে, পছন্দ অবনীশেরও হয়েছে। এত সহজে বিয়েটা হয়ে গেল দেখে রমার ভারী ভালো লেগেছে। ওর মনের কথাটা প্রশান্তই পরে বলেছে,

দেখো তো কেমন জল-ভাতের মতো বিয়েটা হয়ে গেল—আমাদের বেলাতেই যত ফ্যাকড়া—

মনের কথা হলেও রমা একটু টিপ্পনী কাটতে ছাড়েনি। হাসি মুখেই সায় দিয়ে বলেছে, সুমিতার চেহারা ভালো তার ওপর ওর বাবার টাকা আছে—আমার কি আছে ?

প্রশান্ত অমনি ফোঁস করে উঠেছে, সুমির সঙ্গে তোমার তুলনা ! সুমিতা—সুমিতা, আর দশটা মেয়ের মতো বেশ একটা ভালো মেয়ে আর মিষ্টি মেয়ে—আর তুমি হলে গিয়ে চিত্রাঙ্গদা।

সমস্যা ভুলে রমা হেসে উঠেছে !—আর তুমি অর্জুন ?

বেজার মুখ করে প্রশান্ত বলেছে, বাবার খাঁচায় আটকানো অর্জুন —তবে ঠিক তেড়ে-ফুঁড়ে বেরুব একদিন। শূন্য খাঁচা ঝাঁকিয়ে তখন খালি তর্জন-গর্জন করে কাটাতে হবে তাঁকে। হাসতে গিয়ে সমস্যা সেও ভুলেছে, হঠাৎ কি মনে পড়েছে তার।—তোমার সেই কলেজের চিত্রাঙ্গদা পার্ট কিচ্ছু হয়নি—তখন বুঝিনি, পরে ধরেছি।

—কি রকম ?

চোখ পাকিয়ে প্রশান্ত বলল, সব থেকে স্পেকটাকুলার জায়গাটাই ঝেড়ে বাদ দিয়ে গেছলে—চালাকি !

রমার সত্যিই তখন আর মনে নেই অত। কোন্ জায়গাটা ?

—ওই যে,

'গর্ভে আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার,
যদি পুত্র হয়, আশৈশব বীর শিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম !...'

লজ্জায় সমস্ত মুখ লাল, রমা গুম করে তার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়েছে, অসভ্যের ধাড়ী কোথাকার !

রমা খুব ভয়ে ভয়েই সুমিতার বিয়েতে গেছল। ভয়, কারণ প্রশান্তর বাবা মা উপস্থিত থাকবেন সেখানে জানা কথাই। কিন্তু না

গেলে সুমিতা রাগ করবে, দুঃখ পাবে। আর এই একজনও বার বার বলে দিয়েছিল, যেতেই হবে, আগে থাকতেই ভয়ে সেঁধিয়ে থাকবে কেন!

গিয়েছিল। আড়াল থেকে প্রশান্তর বাবা মা-কে দেখেও ছিল। মা-কে দেখে ঘাবড়ায়নি, আর পাঁচটি মেয়ের মতোই সাদামাটা মনে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু যেমন শুনেছিল তেমনিই গুরুগম্ভীর মনে হয়েছিল ভদ্রলোককে। এক ফাঁকে প্রশান্ত এসে ওকে চুপি চুপি বলেছিল, একটু চান্স পেলেই মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ব্যস, বিয়ে বাড়ি থেকে রমা সোজা সটকান।

পরে সুমিতাও এই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে। বলেছে, তুই একটা ভীতুর একশেষ, শাশুড়ী হবার আগেই মাসিমাকে এত ভয়! আর বলেছে, প্রশান্তদা এমন একটা উপকার করল, তার জন্যে যে কি আমি করি ভেবে পাচ্ছি না।

প্রশান্ত বলেছে, দেখিস তোর বরটাকে আবার দিয়ে দিস না।

কিন্তু দুশ্চিন্তা ওদের বাড়ছেই। আর তার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এমন সব ছেলেমানুষি প্রস্তাবও করে লোকটা যে রমা হেসে বাঁচে না। সেদিন ওর বাবার প্রসঙ্গেই রমা বলছিল, দেখলাম তো দূর থেকে, আমার বাপু সত্যিই কেমন ভয় করেছে।

প্রশান্ত তক্ষুনি স্বীকার করেছে, আমার রোজই করে।

—তাহলে? রমার উৎকণ্ঠা।

—তাহলে দু'জনে পালাই চলো।...যত দূরে, মানে একেবারে সভ্য সমাজের বাইরে যত দূরে সম্ভব, নইলে বাবা যা লোক, ঠিক আবার ধরে আনবে।

—ধরে এনে কি করবেন?

—চুলের ঝুঁটি ধরে প্রথমে তোমাকে তাড়াবে তারপর আমাকে জুতো-পেটা করবে।

—তাহলে?

—তাহলে আর এক কাজ করা যাক। সাধু-সন্ন্যাসীরা তো অনেকরকম কাণ্ডকারখানা করতে পারে শুনি, চলো তেমনি কোনো

সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যাই, মন্ত্রের জোরে তারা বাবার মন বদলে দিক।

রমা হেসেই উঠেছিল। তারপর বলেছিল, এর জন্য সন্ন্যাসীর কাছে ছোটার দরকার কি? বিয়েটা হয়ে গেলে মন একদিন না একদিন আমিই বদলে দিতে পারি বোধহয়।

প্রশান্ত সাগ্রহে বলেছিল, তাহলে তাই করে ফেলি এসো। অবনীশটার বিয়ের পর আমার মেজাজপত্র খুব খারাপ, চটপট রেজিস্ট্রি বিয়ে করে, চোখ-কান বুজে দু'জনে সোজা বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

—ও বাবা! রমা আঁতকেই উঠেছিল, তোমার বাবার সামনে?

এ-রকম উদ্ভট উদ্ভট অনেক প্রস্তাব করে সে। হাল্‌কাভাবে যে বলে তা নয়, ভেবে-চিন্তে মাথা খাটিয়ে এক-একটা প্ল্যান বার করে। চোখ থেকে মাথার যন্ত্রণার প্ল্যানটা একবার কাজে লেগে যেতে ওই গোছের অনেক-রকম চিন্তা আর মতলব মাথায় গজায় তার। প্ল্যান নিজের মতো হলে তবে সেটা রমার কাছে পেশ করে। ভিতরে ভিতরে প্রশান্ত সত্যিই গুরুতর চিন্তায় পড়েছে।

কখনো বলে, সেদিনই বাড়ি গিয়ে মা-কে শাসাবে এ বিয়ে না দিলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে। রমার হাসি দেখে বোঝে ও-প্ল্যান অচল। কখনো ভাবে মা-কে শেখাবে এ-বিয়ের জন্য ইষ্টদেবতার স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে—সেই গোছের ভাঁওতা দিয়ে বাবাকে বশ করবে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর একদিন তো এমন মোক্ষম প্ল্যান মাথায় গজালো তার যে আপিস ফেলে রমাদের বাড়িতে এসে হাজির। রমার য়ুনিভার্সিটি ছুটি সেদিন, চুপি চুপি তাকে টেনে আনল। তারপর সাগ্রহে বলল, তোমার সাহসে কুলোয় যদি এবার আর কেউ আটকাতে পারবে না আমাদের বুঝলে?

সত্যি তেমন কিছু আশা করেছিল রমা। আগ্রহ তারও কম নয় কিছুমাত্র।—কি করতে হবে?

—দু'তিন দিনের মধ্যেই দু'জনে পালাব আমরা।

—এ তো পুরনো প্ল্যান!

—আঃ আগে শোনোই না।...পালাবার পর কয়েকদিনের মধ্যে খবরের কাগজে চিঠি পাঠাব আমরা। অমুক মেয়ে আর অমুক ছেলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে—ব্যস্!

রমার দুই চক্ষু বিস্ফারিত।—কি ব্যস, কাগজে খবর পাঠিয়ে আমরা আত্মহত্যা করব?

—দূর পাগল, আমরা বিয়ে করব—সকলে জানবে আমরা আত্মহত্যা করেছি।

রমা হাঁ খানিকক্ষণ। পরে বলেছে, তুমিই আস্ত পাগল একটা। আচ্ছা, তুমি স্কলারশিপ পেয়েছিলে কি করে—আর অত ভালো এনজিনিয়ারিং পাশই বা করলে কি করে?

—কেন, কেন?

—উড়ো খবর কাগজে ছাপবে কেন?

—দু'জনে একসঙ্গে ছবি তুলে কাগজে পাঠিয়ে দেব বাইরে থেকে, এই দু'জন আত্মহত্যা করেছে—আর যেন অন্য লোকে খবর পাঠাচ্ছে। সিওর ছাপবে, তুমি দেখে নিও।

—কি মুশকিল, আত্মহত্যা করলে আমাদের বডি দুটো যাবে কোথায়? তোমার বাবা আর আমার বাবা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুবে নাকি? আর পুলিস চুপ করে বসে থাকবে? আমাদের টেনে বার করবে না! তখন সত্যিকারের আত্মহত্যাই করতে হবে।

এমন প্ল্যানটাও বাতিল হয়ে যেতে প্রশান্ত বিমর্ষ। রমা না থাকলে বা বাধা না দিলে সে-যে একদিনে একটা কিছু চমকপ্রদ বিভ্রাট বাঁধিয়ে বসত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে সামনে বই খুলে রমা এ-কথাই ভাবছিল, আর নিজের অগোচরে হাসছিল অল্প অল্প।

—তোর পরীক্ষা কবে রে?

গম্ভীর প্রশ্ন শুনে রমা চমকেই ফিরে তাকিয়েছিল। ও-ধারে রমার বিছানায় বসে বাদল পড়াশুনা করছিল। দেড়খানা মাত্র ঘর। বাড়িতে থাকলে ও-ঘরে নানান্ সরঞ্জাম ছড়িয়ে বাবা কাজ করে।

অতএব রাতে শোবার সময়টুকু ছাড়া বাদল আর কাজল সর্বদাই এ-ঘরে থাকে। এ-ঘরেই পড়াশুনা করে। কখনো দিদি বিছানায় ওরা টেবিলে, কখনো ওরা একজন বিছানায় দিদি টেবিলে। কাজল কোথায় টো-টো করছে জানা নেই। রমার দুশ্চিন্তা ও ইদানীং অবাঞ্ছিত সংসর্গে মিশছে।

প্রশ্নটা বাদলের। ওর বি. এ. পরীক্ষা এসেই গেছে। ইদানীং ওর হাবভাব চালচলনে আরো একটু গাম্ভীর্য এসেছে। পরীক্ষার জন্য ওর কোনদিন এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই। এ সময়ও পড়ার বই ফেলে হরদম বাইরের বই গেলে। নিজের মনে থাকে। দুনিয়ার প্রায় সব কিছুই ওর জানাশোনা হয়ে গেছে—এইরকম ভাব।

—কেন? রমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

—বাবা জিজ্ঞেস করেছিল।

—বাবা! রমা সন্ত্রস্ত।—কখন?

সামনের বইটা হাতে তুলে নিয়ে বাদল তেমনি গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দুপুরে প্রশান্তদা তোকে চুপিচুপি ডেকে নিয়ে গেছে শুনে।

রমা রেগেই গেল, গলা একটু চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি করে শুনল, বাবা তো তখন আপিসে ছিল?

—বিকেলে জিজ্ঞেস করতে আমিই বললাম।

—ছাখ্, ভালো হবে না বলছি, ফাজলামো হচ্ছে?

জবাব না দিয়ে বাদল গম্ভীর মুখে আবার বইএ মন দিল। কিন্তু রমার পড়া মাথায় উঠল। ও ছোঁড়ার মনে কি আছে আজকাল মুখ দেখে বোঝা ভার। ওর মাথায় বুদ্ধি আছে বলেই আরো বেশি দুশ্চিন্তা। উঠে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সামনের বইটা তুলে নিয়ে ওটা দিয়েই মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল।—মিছে কথা বললি কেন?

—তোর জন্যে। দুশ্চিন্তায়।

—ফের!

—তুই আনন্দে আছিস বলে আমার বইটা ছিঁড়িস না···তুই ফেল করলে বাবার একটু কষ্ট হবে। আড় ভেঙে সোজা হয়ে বসল সে।

—বাবার তো ধারণা তুই একটা সর্বগুণসম্পন্না মেয়ে, তাই ফেলের রাস্তায় না গিয়ে প্রশান্তদাকে বল্ আর হাওয়া না খেয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে দিক।

হাত সত্যিই নিসপিস করছিল রমার, কিন্তু পাজিটা এত গম্ভীর আজকাল যে আগের মতো আর পারে না। মেরে বসলেও এমন করে তাকাবে যে নিজেরই বিড়ম্বনা। তাছাড়া হঠাৎ কি-রকম সন্দেহ হল কিছু একটা ব্যাপার আছে, নইলে এত দিনের মধ্যে কখনো তো এ-প্রসঙ্গে একটি কথাও তোলেনি। কোথাও দেখেটেখে ফেলেছে কিনা ওদের—কে জানে।

ওর গা ঘেঁষে শয্যায় বসে পড়ল ধুপ করে।—পড়তে বসে তোর মাথায় আজ এ-সব চিন্তা এলো কেন, বল্ শিগগীর।

—এসেছে অনেক দিনই, তবে আজ হঠাৎ সুমিতাদি তোকে ডাকতে আসতে তোদের সংকটের ব্যাপারটা বোঝা গেল।

—সুমিতা! কখন এসেছিল?

—প্রশান্তদা তোকে নিয়ে যাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে। আমি তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম।

ভুরু কুঁচকে রমা জিজ্ঞাসা করল, কি তথ্য?

—এই—তোদের পূর্বরাগের পালা আর কতকাল চলবে-টলবে।

রমা চিড়বিড় করে উঠল, তুই মার খেয়ে মরবি বলছি আমার কাছে, আমি তোর বড় না?

সে-কথায় কান না দিয়ে উল্টে বড় ভাইয়ের মতো মুখ করে সে-ই বলল, সুমিতাদির মুখে তখন তোদের সমস্যার কথা শুনলাম। সুমিতাদি তোর মতো নয়, আমার বিবেচনার ওপরে তার একটু আস্থা আছে; সে সত্যিই চায় তোদের বিয়েটা এক্ষুনি হয়ে যাক।...আমার কথা হল, প্রশান্তদাকে বল্ ও-রকম অনেক বাপ তড়পায়, বিয়ে হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত কেউ আর ছেলে বউ ফেলে দেয় না। আর তা যদি না পারে তো আমাকে শ' দুই টাকা দিক, আমি একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আবার রাগতে গিয়ে থমকালো রমা।—কি ব্যবস্থা?

—কাজলকে বলে এ-পাড়ার যারা বোমা-টোমায় হাত পাকিয়েছে তাদেরই লাগিয়ে দিলেই হবে। বাড়ির সামনে তিন দিন তিনটে বোমা ফাটলেই এক্স পুলিস অফিসার বাড়ি এসে মা-মা বলে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবে তোকে। বুদ্ধি বাতলে দেবার জন্য একশ টাকা আমার ফী, বাকি একশ ওদের।

রমা প্রথমে চুলের ঝুঁটি ধরে বসা থেকে ওকে চিৎ করে শুইয়ে দিল। কিন্তু রাগবে কি, নিজেই হেসে বাঁচে না। রাত্রিতে শুয়ে শুয়েও বাদলের কথা মনে হয়েছে আর হেসেছে। সেই সঙ্গে কাজলের জন্যও দুশ্চিন্তা হয়েছে তার। ওটা আজকাল কার সঙ্গে মিশছে কি করছে কে জানে। কালই আচ্ছা করে ধরতে হবে ওকে। কিন্তু সকাল হতে ভুলেও গেছে আবার। এরপর যথাসময়ে প্রশান্তর কাছে বাদলের ওই বেপরোয়া ব্যবস্থার কথাও বলেছে।

শোনামাত্র প্রশান্ত লাফিয়ে উঠেছে একেবারে।—দু'শ' টাকা তাহলে এক্ষুনি ওর হাতে দিয়ে আসি?

রমা ধমকে উঠেছে, মাথা খারাপ নাকি!

কিন্তু এরপর ভাইয়ের ভয়ে প্রশান্তর বাড়িতে ডাকতে আসা প্রায় বন্ধ করেছে সে।

না, বাবার দুঃখের কারণ রমা ঘটায়নি। মোটামুটিভাবে এম.এ-টা পাশ করে ফেলেছে। আর তারপরে মেলামেশার ব্যাপারে অনেকখানি বেপোরোয়াও হয়ে উঠেছে দু'জনেই।

ওদিকে প্রশান্তর ছোড়দার বিয়ে হয়ে গেছে। তার বাবা তখন কৃতী ছোট ছেলের বিয়ের তোড়জোড় করছেন। প্রশান্ত স্পষ্টই তার মা-কে জানিয়ে দিল বিয়ে কোথায় করবে। তার ফলে বাপ আগুন, মা-ও অসন্তুষ্ট। বাড়িতে অশান্তি। বাবাও ঘোষণা করেছেন, অবাধ্য হলে ছেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

রমা এম.এ. পাশ করার পর প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

রমা জবাব দিল, এবারে চাকরির চেষ্টা।

—কি চাকরি? কোথায় চাকরি?

—স্কুলে। মাস্টারি ছাড়া আমি কি আর পেতে পারি?

—খবরদার! স্কুল-মিসট্রেস আমার পছন্দ নয়, দু'দিন না যেতে আমার ওপর মাস্টারি করবে।

—বা রে, তাহলে কি করব? বাবা আর কতকাল টানবেন?

খপ করে তাকে কাছে টেনে প্রশান্ত বলল, বাবা কেন, আমি টানব।

রমা হেসে ফেলেও ভ্রূকুটি করল, বিয়ের আগেই?

প্রশান্ত ভেবে-চিন্তে বলল, না। চোখ-কান বুজে বিয়েটাই আগে করে ফেলি এসো—তোমার ভাই বাদল ঠিকই বলেছিল—কি আর করবে, বাবা মেরে তো আর ফেলতে পারবে না, বড় জোর আলাদা করে দেবে—সে-তো ভালই হবে। আর যদি একেবারেই ছেঁটে দেয় তো দেবে, সম্পত্তির পরোয়া করি না।

কিন্তু রমার মন সায় দেয় না।—না, ও হবে না, গুরুজনের অভিশাপ নিয়ে ঘর বাঁধব কি করে?

ছুটির দিনে বেশ সকাল-সকাল এক-একদিকে বেরিয়ে পড়ে দু'জনে। কখনো ব্যাণ্ডেল, কখনো কাঁচড়াপাড়া, কখনো বা গঙ্গার বুকে ডিঙি নৌকোয়। আর সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে তাই ভাবে। এখনো তেমনি অসম্ভব-অসম্ভব এক-একটা প্ল্যান মাথায় আসে প্রশান্তর। তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ভাবে সমাধান হয়েই গেল। সেদিনও সানন্দে বলল, এবারে তুমি সব ভাবনা-চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকো তো—আর ভাবতে হবে না, রাস্তা পেয়ে গেছি।

—কি-রকম? রমা উৎসুক।

—না তোমাকে বলব না। বললে পরে পাকা প্ল্যান কাঁচা হয়ে যায়, এ-পর্যন্ত তুমি আমার অনেক ভালো ভালো প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছ।

—কাঁচা প্ল্যান বলেই ভেস্তেছে। নইলে আমি তো তোমার দলেই আছি। বলো না শুনি?

—শোনো তাহলে, কিন্তু তোমার কোনো আপত্তি আমি শুনব না আগেই বলে রাখলাম।···প্রথমে এই চাকরিটা আমি কোনো একটা অছিলায় হুট করে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব। বাবা গালাগাল করবে, কিন্তু আবার চাকরি না জোটানো পর্যন্ত বিয়ের কথা বলবে না—। পরীক্ষাসূচক দৃষ্টিতে রমার দিকে তাকালো। অর্থাৎ, শুরুতেই প্ল্যান বাতিল কিনা বোঝার চেষ্টা।

ওই ভদ্রলোক যে-ভাবে ছেলের বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, হঠাৎ চাকরি ছাড়লে তার মানসিক বিপর্যয়টা কি রকম হবে রমা কল্পনা করতে চেষ্টা করল। যত ভালো স্কলার আর এনজিনিয়ারই হোক বেকার ছেলের হাতে কেউ মেয়ে দেবে না।

—তারপর ?

—তারপর আমি অন্য জায়গায় চাকরি যোগাড় করব একটা। সেটা খুব বেশি দিন লাগবে না। যদি উত্তরে চাকরি পাই তো বলব দক্ষিণে চললাম চাকরি করতে, আর দক্ষিণে জুটলে বলব উত্তরে। উত্তর দক্ষিণ যেখানেই হোক দূরের চাকরি জোটাতে হবে। ব্যস তারপর আমি একদম হারিয়ে যাব। তার দিন কতক বাদে আমার চিঠি পেলে তুমিও হারিয়ে যাবে—যখন খোঁজ পাবে ততদিন বাবা-মা দেখবে আমাদের ছেলেপুলে হয়ে গেছে।

লজ্জায় রমা এক খাবলা মাটি ছুঁড়ে মারলো প্রশান্তর গায়ে। ছেলেগুলো চোখ-কান বুজে এ-রকম বলে কি করে ভেবে পায় না। একটু বাদে পরিকল্পনা বরবাদের সুরে বলল, বুদ্ধির ঢেঁকি—তোমার বাবা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখতে চাইবেন না ?

—ওই জন্যেই তো বলতে চাইনি তোমাকে। দেখতে চাইলে দেখাব না, বলব হারিয়ে গেছে।

—আ-হা, তখন সন্দেহ হবে না ?

—হলে হবে।

হালছাড়া মুখে রমা বলল, তাহলে তো ওদের অবাধ্য হয়ে এখানে বসেই বিয়ে করে ফেললে হয়।

—হয় তো, কিন্তু দু'জনের কারোই যে সাহসে কুলোচ্ছে না।

এমন মতলবটাও নস্যাৎ হয়ে যেতে প্রশান্তর বেজার মুখ। কিন্তু মন খারাপ করে দু'জনের কেউই বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। একজন আর একজনকে উৎসাহ যোগায়। নির্জনে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে দু'জনারই। সেই সব নির্জনতার একটা যেন অন্তরঙ্গ ভাষা আছে। হাত ধরাধরি করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে এগোয় দু'জনে। গাছের ছায়ায় ঘন হয়ে বসে। দুপুরে পাখির অলস ডাক কান পেতে শোনে। সমস্যা-টমস্যা সব দু'জনেরই ভুল হয়ে যায় তখন। ওইরকম এক নির্জন পরিবেশে গাছের নীচে বসে রমা ইচ্ছে করেই হঠাৎ সেদিন একটু ঝগড়া টেনে আনল। বলল, সেভাবে চিন্তা করলে একটা রাস্তা পেতেই, তুমি আমাকে ভালবাসো না ছাই—আসলে চিত্রাঙ্গদা পছন্দ তোমার।

—তুমি তো চিত্রাঙ্গদা।

—আমি রমা। তবে চিত্রাঙ্গদার মতো কুৎসিত বটে।

—চিত্রাঙ্গদা কুৎসিত?

—না তো কি?

—তাহলে তুমি একটি অন্ধ, ভেতর দেখতে জানো না।

কথাগুলো যেন কান পেতে আস্বাদন করার মতো। রমার আগেও অনেকদিন মনে হয়েছে, লোকটা এনজিনিয়ার বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কবি। শুধু কবিই নয়, একেবারে অবুঝ কবি।

সামনের গাছটার দিকে তাকিয়ে কাব্যই করল প্রশান্ত। বলল, আমি যদি গাছ হতাম আর তুমি ওই লতার মতো আমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে—বেশ হত।

রমা তক্ষুনি তার কাঁধে গা ঠেকিয়ে আর এক হাতে তার গলা বেষ্টন করে বলল, লতা হবার দরকার কি, এই তো জড়িয়ে থাকলাম।

সেদিন ওই অবুঝ মানুষের রক্তে কেন যে অত দোলা লাগল রমা জানে না। এ-রকম তো আগেও হয়েছে। আগেও ওকে কাছে টেনে নিয়েছে। উষ্ণ তপ্ত আবেগে ওর অধরের বাধা বিচূর্ণ করেছে।

কিন্তু এই দিনের তৃষ্ণার মূর্তিটাই অন্যরকম। ওর দেহটা যেন ক্রমে একটা আবিষ্কারের বস্তু হয়ে উঠতে লাগল প্রশান্তর কাছে। নির্মম, অবুঝ। নিবিড় নিষ্পেষণে সর্বাঙ্গে কি রকম একটা যন্ত্রণার শিহরণ —রমা যেন কোথা থেকে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ তাকে দু'হাতে ঠেলে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল সে। বিস্রস্ত বসন ঠিক করতে করতে ধমকের সুরে বলে উঠল, এই!

একটা ভূত নামল যেন প্রশান্তর কাঁধ থেকে। আত্মস্থ, বিব্রত। —কি··· ?

—রাক্ষুসেপনা কোরো না, সময় ফুরিয়ে গেল নাকি!

কিন্তু শিগগীরই একটা ধাক্কা খেয়ে ওদের দু'জনেরই সামনে মনে হল, সময় ফুরিয়েই গেল বুঝি। এরকম একটা সংকটের মুহূর্ত আসতে পারে জানত দু'জনেই। কিন্তু এলো আর এক মূর্তিতে। প্রশান্তর সঙ্গে তার বাবার মুখোমুখি একটা সংঘাত হয়ে গেল এক বড় লোকের বাড়ির মেয়ে দেখতে যাওয়া নিয়ে। ছেলের সমাচার জেনে পাত্রীপক্ষ একটা বড় লোভের টোপ ফেলেছে সামনে। বিয়ের পর তারা মেয়ে জামাই দু'জনকেই বিলেতে পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ছেলের মতি-গতি ফেরানো গেল না। খুব বিনীতভাবে আর খুব স্পষ্ট করে প্রশান্ত এবার বাবাকেই জবাব দিয়েছে, তার দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়, এবং কারোরই না যাওয়া ভালো।

প্রাথমিক ঝড়টা প্রশান্তর ওপর দিয়ে গেল। তারপর ভেবেচিন্তে ভদ্রলোক চিঠি দিয়ে রমার বাবাকে ডেকে পাঠালেন একদিন।

রমার বাবার কাছেও প্রশান্ত অচেনা কেউ নয় আর। বাড়িতেই বারকয়েক দেখেছেন তাকে, বিশেষ করে মেয়ের এম. এ. পরীক্ষার পাশের পরে। ছেলে বাদলের কাছে শুনেছে, মস্ত ঘরের কৃতী ছেলে, এবং এর সঙ্গেই দিদির বিয়ে হবে একদিন। ভাবলেন, এবারে

পাকা কথাবার্তার জন্য ডাক পড়েছে। বেশ খুশি চিত্তেই গেলেন।

একমাত্র রমা ভয়ে দুরু দুরু। ওই ভদ্রলোকের সম্পর্কে এত জানে যে এখন আনন্দের বদলে একটা অজানা আশংকার ছায়া পড়ছে মনে। বাদল ছিল সামনে, তাকেই বলল, কি হবে রে, বাবাকে যদি কিছু বলে দেয়?

বাদলটা যেন আরো গম্ভীর আর আরো মাতব্বর হয়েছে আজকাল। নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, সে-ভয় আছে যখন, বাবাকে ডাকার সুযোগ দেওয়া তোমাদের উচিত হয়নি—বিয়েটা ঢের আগেই করে ফেলা উচিত ছিল।

রমা চুপ। বাদল উচিত কথাই বলেছে। সাহস করে বিয়েটা করে ফেলতে পারলে আজ বাবাকে নিয়ে অন্তত টানাটানি পড়ত না।

ওদিকে অভ্যর্থনার ঠাণ্ডা ভাবগতিক দেখেই রমার বাবার খটকা লাগল কেমন। বাজে ভণিতায় সময় নষ্ট না করে প্রশান্তর বাবা তার মুখে জানতে চাইলেন, মেয়ের বিয়েতে কি করতে পারবেন।

রমার বাবা জবাব দিলেন, আপনি চাইলে শুধু বিয়েই দিতে পারব, আর কিছু করার সঙ্গতি নেই।

তপ্ত বক্রস্বরে প্রশান্তর বাবা বললেন, সেটা কি বেশি আশা করা হচ্ছে না?

রমার বাবা জবাব দিলেন, এর মধ্যে আমার কোন হাত নেই।

—আপনার মেয়েকে বোঝাবার হাত বা দায় আমার?

আপনার ছেলেকে বোঝাবার হাত বা দায় আপনার।

নিঃস্ব লোকের এই উক্তিতে প্রশান্তর বাবা অপমানিত বোধ করলেন। আর আসল অপমানিত মানুষটি নিঃশব্দে উঠে এলেন।

রমা বাবার ঘরে ভরসা করে ঢুকতে পারল না পর্যন্ত। ফিরে এসে বাবা কাজে বসে গেছেন। কিন্তু কাজে যে মন দিতে পারছেন না, রমা এ-ঘর থেকে লক্ষ্য করছে। কেমন রক্তশূন্য বিবর্ণ দেখাচ্ছে বাবার মুখ। ছোট ভাই বাদল আর কাজলও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বার দুই তাঁকে দেখে গেছে। কাজল সবিস্তারে জানে না কিছু। ইদানীং ঘরের

সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো কম। বিশেষ কিছু ঘটেছে তাই শুধু মনে হল তার। বাদল বাবার মুখখানা লক্ষ্য করার পর দিদিকেও আবার মনোযোগ সহকারে দেখে নিয়ে পড়ার টেবিলে বই খুলে বসেছে। এই নীরব ভর্ৎসনা যেন খচ করে বুকে বিঁধল রমার, ভাই যেন বলতে চায় তোদের ছেলেমানুষিরও একটা সীমা থাকা উচিত ছিল।

এ-ঘরে এসে দাঁড়াল।—বাবা! বাবা ফিরে তাকালেন।

—ওঁরা তোমাকে ডেকে নিয়ে অপমান করেছেন!

জবাব না দিয়ে বাবা ঠাণ্ডা মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানে বিয়ে হওয়ার ব্যাপারে কোনরকম বাধা আসতে পারে তুই জানতিস? রমা জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। বাবা যেটুকু বোঝার তাই থেকেই বুঝে নিলেন। বললেন, নিজের মান-অপমানের কথা আমি ভাবছি না, কিন্তু তোরা এরপর কি করবি?

রমা বলল, আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবোনা বাবা।...কিন্তু তাঁরা তোমাকে কি বলেছেন জানালে ভালো হত।

বাবা শান্ত মুখেই সব বললেন।

শুনে রমা রাগে জ্বলতে লাগল। বাবা ওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নিয়ে ও-বাড়ি থেকে ফেরেননি। তবু তাঁর অপমান ওকে মর্মান্তিকভাবে বিঁধল। ঘরে মা নেই, ওদের কাছে বাবা অনেকখানি।

এ-ঘরে ফিরে আসতে কাজল তপ্ত মুখে তাকালো ওর দিকে। ইতিমধ্যে বাদলের মুখে ঘটনার আভাস পেয়ে থাকবে। আর এ-ঘরে বাবার সঙ্গে ওর কথাবার্তাও শুনেছে নিশ্চয়।

নিষ্ফল আলোচনায় হা-হুতাশ করার ধাত নয় ওর। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোক থাকেন কোথায় বল্ তো?

—কে ভদ্রলোক?

—কে ভদ্রলোক ভাল করেই জানিস, ওই প্রশান্তদার বাবা।

—তাদের ঠিকানাটা কি?

গলার স্বরে চাপা ঔদ্ধত্য। বিরক্তির চাপে রমা জিজ্ঞাসা করল, তাঁদের ঠিকানা নিয়ে তোর কি হবে।

—বাবাকে অপমান করে ফেরালেন, ভদ্রলোককে একবার দেখে আসি আমি। কাজল হাসল, তুই অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন, আমি খারাপ ব্যবহার কিছু করব না, একটু কথা-বার্তা বলে দেখব ভদ্রলোকের মত ফেরানো যায় কিনা, আমার মনে হয় ফিরবে।

অনেক দিন আগে বাদল কি বলেছিল মনে পড়ল। ঠাট্টা করে বলেছিল, কাজলকে বলে পাড়ার যারা বোমা-টোমায় হাত পাকিয়েছে তাদের লাগিয়ে দিলেই সমস্যা মিটে যাবে। আজ প্রকারান্তরে কাজল নিজের এই গোছের শাসানীর ইঙ্গিত করেছে। নিজের সমস্যা ভুলে রমা চটেই গেল।—তোর বড় বেশি বাড় বেড়েছে কাজল, কেমন? তুই খুব খারাপ রাস্তায় চলেছিস বলে দিলাম, এখনো সাবধান না হলে তোর কপালে দুঃখ আছে।

—লাও ঠ্যালা। আমি গেলাম ভালো করতে না এক ঝুড়ি উপদেশ। থাক, আমি এর মধ্যে আর নেই। সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাদল নির্লিপ্ত মুখে সামনের বইয়ের দিকে চেয়ে বসে আছে। পড়ছে না এক বর্ণও জানা কথা। ওর দিকে চেয়ে কেন যে রাগ হতে থাকল রমার। ও-যেন একটা ছেলেমানুষি ঘটনা আর তার পরিণামের নির্লিপ্ত দর্শক। এবং বাবার দিকটা চিন্তা করে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত।

আগের মতো দুটো চড়-চাপড় লাগিয়ে দিতে পারলে দিত।

দুপুর গড়িয়ে গেল। রমা সেই থেকে ছটফট করছে। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে। ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরছে ওর নীরব ছটফটানি ততো বাড়ছে। বিকেল সোয়া-পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা হয় প্রশান্তর সঙ্গে। এটা একটা শর্তের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যে আগে আসবে, অপেক্ষা করবে। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ-ছ'দিনই আগে প্রশান্ত আসে, আর তার জন্যে অনেক অনুযোগও শুনতে হয়। অভিমান বেশি হলে রমাও এক-একদিন ঝাঁঝ দেখায়, তোমার মতো তো বড় অবস্থা নয় আমার, গরিবের মেয়ে, অনেক দিক সামলে-সুমলে আসতে হয়।

এই গোছের কথার পরে অবশ্য আর মান-অভিমান থাকে না।

তারপর হাসিমুখেই দু'জনে কোন না কোন দিকে বেরিয়ে পড়ে।

…আজ মানুষটা দুঃখই পাবে। কারণ, রমা আজ আর বেরুবে না ঠিক করেছে। গিয়ে কি করবে, যা ঘটে গেছে তা নিয়ে কোনো আলোচনাও ভালো লাগবে না।

কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরছে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ ততো টানছে ওকে। আর মনে হচ্ছে না গেলে দুঃখ আরো বেশি পাবে। বাড়ির এরা যে যা-ই ভাবুক, ওই লোককে রমা দোষ দেয় না! সে-ও ওর মতোই অসহায়। অথচ এ-রকম একটা ব্যাপারের পর বেরোয় কি করে…বাদল ঘরে বসে আছে, আজও বেরুতে দেখলে ও মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু কি-যে ভাববে ঠিক নেই।

…সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, পৌনে ছ'টা এখন। ভয়ানক অবসন্ন লাগছে রমার। গরমের বেলা, সন্ধ্যা হতে দেরি আছে, রমার ইচ্ছে করছে এখনো ছুটে চলে যায়। কিন্তু বাইরেটা অবসন্ন, শিথিল।

বাদল একটু উঠে গেছল মাঝখানে। ফিরে এসে বলল, মোড়ের মাথায় প্রশান্তদা দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম—

চমক ভেঙে রমা বসা থেকে উঠে দাঁড়াল।—ডাকলি না কেন?

—আমি যাইনি, রাস্তার দিকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম।…বাবা এসে পড়বেন খানিকক্ষণের মধ্যে, তুই বরং যা।

এই ছেলেকে আর যা-ই ভাবুক, অবুঝ ভাবা যায় না। রমা পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামা-কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিল। তার তাড়া, লোকটা না এরই মধ্যে অভিমান নিয়ে ফিরে চলে যায়।

…না, দাঁড়িয়েই আছে। রমা নিশ্চিত বোধ করল। কাছে গিয়ে সহজ সুরে কথাও বলতে পারল।—তীর্থের কাকটির মতো এখানে দাঁড়িয়ে আছ, বাবা যদি এসে যেতেন?

প্রশান্ত ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তিনি ঘরে নেই নাকি?

এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা মানেই পাঁচজনের চোখ টানা। সামনের দিকে পা বাড়িয়ে রমা মাথা নাড়ল, বাড়ি নেই।

—তাহলে আমি মিছিমিছি সময় নষ্ট করলাম, কষ্টও পেলাম।…

যাক, তুমি আজ ঘর-বন্দি কেন? রাগ করেছ না বাবা কিছু বলেছেন?

—বাবা কিছু বলার মানুষ নন।

সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছে, প্রশান্ত সেটা ডেকে নিল। আপত্তি না করে রমা উঠে বসল। পাশে প্রশান্ত। শিখ-ট্যাক্সিঅলাকে গঙ্গার দিকে যেতে নির্দেশ দিয়ে ওর দিকে ঘুরে বসল।

—বাবা কিছু বলার মানুষ নন যখন, তাহলে তুমিই রাগ করেছ?

জবাব না দিয়ে রমা চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

হঠাৎ অসহিষ্ণু সুরে প্রশান্ত বলল, আচ্ছা, আমাকে তুমি একেবারে কাপুরুষ ভাবো, তাই না?

রমা মাথা নাড়ল, ভাবে না।

—তাহলে কি ভাবো?

একটু হাল্‌কা করেই জবাব দিল, পুরুষ ভাবি।

এটুকুতেই খুশি। হাসিমুখে একবার ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, ও ব্যাটা ভাষা না বুঝুক, কাজ বুঝবে—ঠিক যা-ই বুঝুক প্রমাণ দেবার লোভ হচ্ছে—

ভারাক্রান্ত মন সত্ত্বেও রমা হাসিমুখে ভ্রূকুটি করে সরে বসল একটু। —এখানে লোভ করতে গেলে আমি দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

প্রশান্ত বলল, লোভ বিসর্জন দিলাম তাহলে।···কিন্তু পুরুষ মানুষের প্রমাণ আজ বাড়িতেও একটু দিয়ে ফেলেছি।

রমা উতলা, আবার উৎসুকও।—কখন? কাকে?

—এখানে নয়, চলো বলছি। কিন্তু তবে আগে তুমি বলো, আমার ওপর রাগ করেছিলে কেন?

—রাগ করিনি।

—তাহলে ঘরে বসেছিলে কেন?

—কিছু ভালো লাগছিল না, মনটা বড় খারাপ হয়েছিল।

—সেই জন্যেই তো আরো আগে আমার কাছে ছুটে আসা উচিত ছিল তোমার। আমি না এলে?

—এসেছ তো।

—ও, কথা শুনি না—তোমার মন খারাপ আর তোমার বাবা আমাদের বাড়ি এসে ও-ভাবে অপমান হয়ে গেলেন—আমার মন খুব ভালো, না? কি বলে আমাকে তুমি এ-ভাবে কষ্ট দাও?

রমা নিরুত্তর। একটু হাল্‌কা বোধ করতে চেষ্টা করছে। যদিও জানে, এই মানুষের হৃদয় যতই স্পষ্ট করে বোঝা যাক, তাতে সমস্যার সমাধান খুব হবে না। গঙ্গার ধারে একটা নিরিবিলি জায়গায় দু'জনে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসল। মাঝের সুশোভন ব্যবহারটুকুও যেন এই লোক আজ বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

রমা জিজ্ঞাসা করল, বাড়িতে কি হয়েছে, রাগারাগি করেছ নাকি?

—রাগারাগি বাবা করেছে। আমি তার জবাব দিয়েছি।

—কাকে? বাবাকে?

—হ্যাঁ। খুব স্পষ্ট করে, মুখের ওপর। এখন সেটা ভাবতেও ভয় করছে।

রমা হেসে ফেলল।—খুব বীরপুরুষ। বাবাকে কি বলেছ শুনি?

—সেটা শুনতে হলে আমার তখনকার মানসিক অবস্থাটা আগে তোমাকে শুনতে হবে।...তোমার বাবা আজ আসছেন জানা ছিল, তার আগে থেকে এঁদের হাবভাব দেখেই খুব খারাপ লাগছিল। এঁদের বলতে বাবার, মা সর্বদা ভয়ে বাবার কথায় সায় দেন।...তোমার বাবা এলেন, এক পেয়ালা চাও তাঁর সামনে এগিয়ে দেওয়াটা কেউ দরকার বোধ করল না। তারপর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁকে অপমান করার বহরটা দেখলাম আর শুনলাম।

—তারপর? রমা উদগ্রীব।

—তারপর আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। এসেই প্রথম ইচ্ছে হল ঘরে যা কিছু আছে ভেঙেচুরে তছনছ করে আমার মেজাজটা সকলকে বুঝিয়ে দিই।

—বেশ। রমা হেসেই ফেলল।—বাবার সঙ্গে কি কথা হল বলো?

—বলছি। মেজাজ অত না চড়লে কিছুই বলা যেত না। তোমার বাবাকে বিদেয় করে আমাকে ডাকার আর তর সইল না, রাগতমুখে

বাবা নিজেই আমার ঘরে চলে এলেন। এসেই বললেন, এই তোর বুদ্ধি, এই তোর বিবেচনা! কোথাকার একটা হা-ঘরের মেয়ের জন্যে বাড়ির সকলের মুখে এ-ভাবে চুণ-কালি দেবার কথা ভাবার সাহস তোর হল কেথেকে?

নীরবে একটা আঘাত সামলে রমা আবছা অন্ধকারে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এক হাতে তার কাঁধ বেষ্টন করে প্রশান্ত আরো একটু কাছে ঝুঁকল। —ব্যস ওই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। আমি বললাম, মুখে চুণ-কালি দেবার কাজটা তোমার থেকে ভালো আর কেউ পেরে উঠবে না। তুমি যে ব্যবহার করেছ ওই হা-ঘরের ভদ্রলোক এরপর এ-বাড়িতে তাঁর মেয়ে পাঠাতে রাজি হবেন কিনা সন্দেহ।...তিনি কোন্ দরের শিল্পী পুলিসে চাকরি করে সেটা বোঝা একটু শক্ত।

রমার বিশ্বাস হয় না যেন।—তুমি বাবাকে বললে এ-কথা?

—বিশ্বাস করো একেবারে জলভাতের মতো বললাম। আর বাবা এমন চেয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ যেন আমি পাগলা গারদের জীব একটি। তারপর অবশ্য চারখানা হয়ে ফেটে পড়লেন।—এত সাহস তোর! ওই মেয়ের জন্য আমাকে শুদ্ধ অপমান করিস তুই। রাসকেল কোথাকার, মস্ত লায়েক হয়ে উঠেছ, কেমন? এর পরেও ওই মেয়ের সঙ্গে তোমার আমি বিয়ে দেব ভেবেছ?—আমি বললাম, বিয়ে ওখানেই আমি করব, নয়তো কোথাও করব না।...শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমাকে চোখ দিয়ে ভস্ম করতে লাগলেন, সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকতে সত্যিই আর সাহসে কুলোলো না, ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম।...আমি বেরিয়ে আসার আগে পর্যন্ত বাবা গুম হয়েছিলেন, এখন নিশ্চয় মা-কে বকাবকি করছেন।

খানিক চুপচাপ থেকে রমা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। সমস্ত দিনের যন্ত্রণার অনেকটাই উপশম হল বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়ল বই কমল না। বলল, এর ফল তো ভালো হবে না, মাঝখান থেকে তোমার

আরো দুর্ভোগ হবে।

—হয় হবে। মুখ বুজে কাঁহাতক সহ্য করা যায়! পরক্ষণে রমার ওপরেই রাগ।—সব দোষ তোমার, কিছুতে সাহস করে বিয়েটা করে ফেলতে পারছ না। শোনো, হয় কোনো প্ল্যান করে দু'জনে কেটে পড়ি এখান থেকে, নয়তো বাবার নাকের ডগায় বসেই বিয়েটা করে ফেলি এসো।

এ-রকম ছেলেমানুষি কথা রমা অনেক শুনেছে। এই লোক সে-রকম বেপরোয়া হতে পারে বলে নিজেই বিশ্বাস করে না। যদিও এর প্রতি আকর্ষণেব মূলেও হয়তো এই ছেলেমানুষি।

ও-দিকে এ-ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্রশান্তর বাবা তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তা বলে মুখের ওপর ওই উক্তি করার মতো অধঃপতন হয়েছে কল্পনাও করেননি। রাগ পড়তে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। ছেলেকে কলকাতা থেকে আপাতত সরাতে না পারলে এ মোহ কাটবে না বলে বিশ্বাস তাঁর। বম্বেতে বড় ছেলের সঙ্গে এ নিয়ে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলছিল। রমার বাবার সঙ্গে আর পরে ছেলের সঙ্গে কথা হবার সাতদিনের মধ্যে হেড-অফিস অর্থাৎ বম্বেতে পত্রপাঠ বদলির অর্ডার পেল প্রশান্ত। সেটা যে দাদারই চেষ্টার ফল, বুঝতে বাকি থাকল না।

এ-খবর প্রশান্তর মুখ থেকেই শুনল রমা। শোনার পর খানিকক্ষণ গুম সে। একটু বাদে জিজ্ঞাসা করল, বম্বে যাচ্ছ তাহলে?

—তুমি কি বলো, চাকরি ছেড়ে দেব?

একটু চুপ করে থেকে রমা বলল, না, যাও।

প্রশান্ত অসহিষ্ণু, উতলাও।—তুমি এ-ভাবে কথা বলছ কেন? সব তো জানো, আমার কি দোষ! দাদার সঙ্গে বাবার সেই থেকে চিঠি চালাচালি চলছে টের পেয়েছিলাম, তাঁরা এই মতলব এঁটেছে বুঝিনি। কিন্তু এই করে বাবা বা দাদা বা দুনিয়ার কেউ আমাদের আটকাতে পারবে?

—পারবে না ?

—পাগল ! তুমি আমাকে এই বিশ্বাস করো ? রাগে ক্ষোভে সত্যি তার দু'চোখ অস্বাভাবিক জ্বলতে দেখেছে রমা। জোর দিয়ে প্রশান্ত বলেছে, এক বছরে হোক, দু'বছরে হোক, পাঁচ বছরে হোক, বিয়ে আমাদের হবেই। যতদিন না হয় আমার প্রতীক্ষায় তুমি থাকবে, তোমার প্রতীক্ষায় আমি থাকব।

—সত্যি ?

—সত্যি।

—সত্যি ?

—সত্যি সত্যি সত্যি। মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়েও মুখের দিকে চেয়ে প্রশান্ত থমকালো একটু। তারপর বিষণ্ণমুখে হাসল একটু।—কিন্তু আমাকে এখনো তুমি বিশ্বাস করলে না।

—করলাম না ?

প্রশান্ত মাথা নাড়ল, না।

দরদে রমার ভিতরটা ভরে গেল। দু'হাত বাড়িয়ে তার মাথাটা বুকে টেনে আনল। বলল, বিশ্বাস করেছি। তুমি আমার অপেক্ষায় থাকবে, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।

তিন দিনের মধ্যে প্রশান্ত বম্বে চলে গেল। রমার জগৎটা যেন শূন্য হয়ে গেল হঠাৎ। প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং নেওয়ার ওপর নির্ভর করতে পারে না এমন নয়। আর যাই হোক, মানুষকে এতটুকু অবিশ্বাস করে না। তবু কি যেন একটা অনিশ্চয়তা ছেঁকে ধরতে চায় ওকে।

সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়। সুমিতা বলে, প্রশান্তদা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে ভালোই হয়েছে। চিঠিপত্র লিখে তুইও বম্বে চলে যা, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পেতে বোস্—অত ভয়ের কি আছে, কলকাতা থেকে ছুটে গিয়ে তোর শ্বশুর তোকে গিলে খাবে নাকি !

না, রমা এতেও সায় দিতে পারেনি। এত বাধা উপেক্ষা করে এ-ভাবে কারো ছেলে ছিনিয়ে নিতে ও পারবে না। পারলেও শেষ পর্যন্ত সেটা সুখের হবে বলে ও ভাবে না।

তিন মাসের মধ্যে রমা প্রশান্তর চতুর্থ চিঠি পেল—কিন্তু খামের ওপর পোস্টাল ছাপ দেখেই সে হাঁ। চিঠি আসলে বিলেতগামী জাহাজ থেকে। সুযোগ পেয়ে চাকরি ছেড়ে সে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। রমা যেন প্রতীক্ষায় থাকে। অবনীশ লণ্ডনে আছে এখন, আপাতত তার ওখানে উঠবে, তারপর অন্যত্র ব্যবস্থা করে ওকে জানাবে।

এই সবই ঘটে গেল রমার এম. এ. পাশ করার ছ'মাসের মধ্যে।

আরো তিন মাস বাদে রমার মাথায় বুঝি বাজ পড়ল একটা। খবরটা দিল সুমিতা। তার স্বামী অবনীশও বিলেতে তখন। আরো মাস ছয়-সাত বাদে ফেরার কথা। এ-সময়ের বেশির ভাগ সুমিতা বাপের বাড়ি কাটাচ্ছে। তাই দেখাশুনা প্রায়ই হয়। কিন্তু সেদিন দুপুরের নিরিবিলিতে সে-ই রমাদের বাড়ি এলো। ওর মুখ দেখেই রমার মনে হল কিছু একটা ঘটেছে। অথচ বলে উঠতে পারছে না। অন্য দিন অবনীশের কথা ওঠে, প্রশান্তর কথা ওঠে।

সেই পুরনো সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামায় দু'জনে।

সুমিতা কতদিন বলেছে, দেখ না, প্রশান্তর ডাক এলো বলে, তোকে শেষ পর্যন্ত ঠিক বিলেতেই যেতে হবে, সেখানেই ঘর-করনা পেতে বসতে হবে!

এ-চিন্তা দিবা-স্বপ্নের মতোই। তবু কল্পনা করতে ভালো লাগে রমার। মনে মনে ভাবে, সব ব্যবস্থা করে ডেকে যদি পাঠায়ই, আর ওর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু থাকবে না, ঠিক রওনা হবে।

কিন্তু এই দিন সুমিতা ওই দুই প্রবাসীর সম্পর্কে একটি কথাও তুলল না। কিন্তু মুখ শুকনো, আর কি-রকম যেন উসখুশ করছে।

—কিছু যেন বলবি মনে হচ্ছে. বল্ না?

হঠাৎ রাগত মুখেই সুমিতা বলে উঠল, বলব আবার কি—পুরুষ মানুষগুলো ওই রকমই, তাদের আবার প্রেম, তাদের আবার

ভালোবাসা।

রমা ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন একটু।—কি হয়েছে বল্ না, অবনীশ-বাবুর কিছু ব্যাপার না তো?

সুমিতা থতমত খেল। তারপর তেমনি অসহিষ্ণু ক্ষোভে বলল, হলে অবিশ্বাস করার কিছু নেই···প্রশান্তদা মেম বিয়ে করেছে শুনেছিস্?

রমা বিষম চমকে উঠল। তারপর অবিশ্বাস করল। বিশ্বাস করবে কি করে—মাত্র তিন সপ্তাহ আগেও সে প্রশান্তর আবেগ ভরা চিঠি পেয়েছে। হেসেই ফেলল।—এমন সু-খবরটা তোকে কে দিলে?

সুমিতা ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। বিশ্বাস করল না দেখেই আরো বেদনাহত যেন। ওর চোখে জল আসার উপক্রম। হাত-ব্যাগটা খুলে একটা বিলেতের ছাপ-মারা চিঠি বার করল। একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, এখানটা পড়্—

অবিশ্বাস করলেও ওর হাবভাব দেখে রমা ঘাবড়েই গেল একটু। কাঁপা হাতে চিঠিটা নিল। অবনীশ লিখেছে। '···এখানে প্রশান্ত খুব ফুর্তিতে আছে। ওর ফুর্তির মাত্রা দেখে আমার একটু ভয় ধরেছে। ও যে ফার্ম-এ কাজ করে তার এক পার্টনারের ডিভোর্সড্ মেয়ের সঙ্গে ও যেভাবে মেলা-মেশা শুরু করেছে, আমার আদৌ ভালো লাগছে না। ওই মেয়ের সুপারিশে তার কাজেরও রাতারাতি উন্নতি হয়েছে। প্রশান্তকে আমি বার কয়েক সতর্ক করেছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি—উল্টে যেন বিরক্ত। সেদিন স্পষ্টই বলে দিলে, তোমার থেকে আমার বুদ্ধি বিবেচনা কম এ-কথা ভাবার কারণ কি?···যাক্, কি যে হবে, এর পরিণাম জানি না। সীরিয়াস ছেলেগুলোকে এ-সব ব্যাপারে আমার বড় ভয়।'

প্রশান্তর সম্পর্কে এটুকুই। রমার মুখে একটা সঙ্কল্প যেন নিবিড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এতে তো এর বেশি লেখা নেই।

—বিয়ের কথা তোকে কে বলল?

সুমিতা ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল, বাড়িতে গত পরশু চিঠি এসেছে। ওদের ছবিও।

রমা সমস্ত শক্তি ঢেলে বলেছে, আমি বিশ্বাস করি না।

সুমিতা এবার হাত-ব্যাগ থেকে আর একখানা খাম বার করল। বিষণ্ণ মুখে সেটাও তার দিকে বাড়িয়ে দিল।—মাসিমার কাছে এসেছে, দেখ্…তাদের বাড়িতে হুলস্থুল ব্যাপার চলছে সেই থেকে।

…অবিশ্বাসের আর কিছু নেই। নিজের দু'চোখ উপরে ফেলেও অবিশ্বাস করা সম্ভব হলে রমা তাই করত বোধহয়। এক তরুণী শ্বেতাঙ্গিনীর বাহু বেষ্টন করে প্রশান্ত দাঁড়িয়ে। দু'খানি হাস্যোজ্জ্বল মুখ। চিঠিতে তার মাকে প্রশান্ত লিখেছে, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জানি, পারো তো আমাকে আশীর্বাদ করো।'

এরপর দিনকয়েক পর্যন্ত রমার মাথায় শুধু আগুন জ্বলছে। ভাইকে কিছু বলতে পারেনি, বাবাকে তো না-ই। গুম হয়ে থাকে, আর কেবল জ্বলে জ্বলে জ্বলে।

কিন্তু বাবার কাছেও খবর গোপন থাকল না। বাদল হয়তো সুমিতার কাছেই শুনে থাকবে। কে কতটা আঘাত পাবে তা নিয়ে ও মাথা ঘামায় না। বাবাকে সে-ই বলেছে।

বাবার স্তব্ধ মুখ। মেয়েকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছেন, খবরটা ঠিক কি না।

রমা নির্বাক, কঠিন।

এদিকে ভদ্রলোক নিজেও কিছু ঝামেলার মধ্যে ছিলেন। প্রথম ঝামেলা ছোট ছেলে কাজলকে নিয়ে। প্রায়ই সে উধাও হয়ে যায় কোথায়। চার পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তার দেখা মেলে না। বাদলকে জিজ্ঞাসা করে বাপের ধারণা হয়েছে, প্রাণের ভয়ে মাঝে মাঝে পালাতে হয় তাকে। এর মধ্যে একদিন পুলিসও এসে তার খোঁজ নিয়ে গেছে। এর বেশ কিছু কাল আগে বাড়ি ছাড়ার কেস্ চলছিল বাড়িওলার সঙ্গে। প্রতিপক্ষ ডিক্রি পেয়েছে। একটা নির্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার হুকুম হয়েছে। এই ছোট ছেলে কাজলের ভয়েই বাড়িওলা ডিক্রি পেয়েও এতদিন মুখ বুজে ছিল। সময় বুঝে এখন তার আচরণ বদলেছে। এরই মধ্যে মেয়ের এই আঘাত। অন্য বাড়ি ঠিক করে এক মাসের ছুটি নিয়ে ভদ্রলোক ছেলেদের আর মেয়েকে নিয়ে বাইরে

বেরিয়ে পড়লেন। আর তারপর ফিরে এসে সহরতলীর বাইরে সেই ভিন্ন বাড়িতে এসে উঠলেন।

···ভিতরে ভিতরে রমা যাতনার মতো একটা তাগিদ অনুভব করে সর্বদা। সাধারণ মেয়ের অসামান্য হয়ে ওঠার তাগিদ। ভিতরটা যেন একটা জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে উঠছে তার। আর এই তাগিদটা ততো বাড়ছে। ছোট ভাই কাজলের সমস্যাও ওর মাথায় নেই তেমন।

আগে স্কুল-মাস্টারির চেষ্টা করছিল, এখন সে-চেষ্টা ছেড়ে দিল।

এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ এক নামজাদা চিত্র-পরিচালকের নামে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল একটা। নায়িকার ভূমিকার জন্য একজন শিক্ষিতা অভিনেত্রী চাই। ফোটো সহ আবেদন করতে হবে।

···অসামান্য হবার যোগ্যতা ছিল রমা মিত্রের। বিজ্ঞাপন দেখে মাথায় একটা ঝোঁকই চাপল। নতুন করে নিজের ছবি তুলে আবেদন পাঠিয়ে দিল। ছবি দেখে পুরুষের চোখে বাতিল হবে না, এ বিশ্বাস দ্বিগুণ এখন। তবু ভাগ্যের চাকা এমন বিপুল বেগে ঘুরবে ভাবতে পারেনি।

ডাক এসেছে।

কথা বলে আর ছাত্রী জীবনের অভিনয়ের একরাশ মেডেল দেখে পরিচালক খুশি একটু। ট্রায়েল দিয়ে আরো খুশি। চমৎকার ফোটোজেনিক মুখ, সুন্দর ভয়েস, নাক মুখ চোখ ভালো, এম. এ. পাশ —আর সব থেকে বড় কথা অভিনয়ে বুদ্ধিদৃপ্ত সহজ দক্ষতা আছে। পরিচালকের আশাতীত পছন্দ হয়ে গেল।

প্রথম কণ্ট্রাক্ট সাত হাজার টাকার। সই করতে হাত এতটুকু কাঁপল না রমা মিত্রের। প্রযোজক দু'হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিল। এত টাকা একসঙ্গে ছুঁয়ে দেখেনি কোনদিন। অথচ নির্লিপ্ত হাতে সে-টাকা নিয়ে ব্যাগে রাখতে পারল। কি ছবি, কি গল্প তা নিয়েও মাথা ঘামায়নি।

বাড়ি ফিরে বাবাকে বলল, কাজ পেয়েছে। ফিল্মএর কাজ।

বাবা অবাক।—ফিল্মএর কাজ মানে?

মানেটা রমা আর বলল না কিছু। বাবা বুঝলেন। ভাইরা বুঝল।

কেউ আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল না। বাবার মুখখানা রমা শুধু বিষণ্ণ দেখল। আর বাদলের উদাসীন মূর্তি। কাজলের স্বভাব বদলায়নি, সে সংসার চিত্রের খবরও রাখে না ভালো করে। অসহিষ্ণু রাগে ভিতরটা সর্বদা দপদপ করে রমার। বাইরেটা কঠিন।

কাজ শুরু হল। এক নতুন জগৎ। নতুন জীবন। রমা মিত্র এখানে শুরু থেকেই একনিষ্ঠ সাধিকা। তিন মাসের কাজ হতে না হতে স্টুডিও মহলে রটে গেল—একটি অসামান্য প্রতিভার অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটেছে। যে পর্যন্ত ছবির কাজ হয়েছে পর্দায় তার প্রজেকশন দেখে পরিচালক, প্রযোজক এবং কলাকুশলী তো মুগ্ধ।

সাড়ে চার মাসের মধ্যে, অর্থাৎ এই ছবি শেষ হবার আগেই দশ হাজার টাকা করে আরো দুটো ছবির কন্ট্রাক্ট সই করল, এবং তার এ্যাডভান্সও হাতে এলো।

...কাজের চাপ বাড়ছেই। বাড়ি ফেরা অথবা বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ও আর কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকছে না। বাবা কিছুই বলেন না। ভাই তেমনই উদাসীন। কিন্তু সহরতলীর এত দূরে বাসের দরুন তার বাস্তবিকই অসুবিধে হচ্ছে।

একদিন বাবাকে বলল, আমাদের কিছু বেশি ভাড়ায় দক্ষিণ কলকাতায় ভালো বাড়ি দেখে নেওয়া দরকার।

বাবা খানিক ওর দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন, তোর অসুবিধে হয় বুঝতে পারছি, নিজে চালাতে পারলে ব্যবস্থা করে নে।

—তুমি যাবে না?

—আমরা এখানে ভালো আছি।

এর থেকে স্পষ্ট করে বাবা আর কি বলবে? রাগে দুঃখে চোখে জল আসার সামিল রমার। এ ঘরে বাদলকে বলল, বাবা ঘুরিয়ে আমাকে বাড়ি ছাড়ার নোটীস দিলেন, তুই কি বলিস্?

বাদল চেয়ারে বসে পা দোলালো একটু। সহজ অথচ নিস্পৃহ মুখে বলল, বাবা বুদ্ধিমান মানুষ, ঘুরিয়ে নোটীস না দিলে কিছুকাল বাদে তুই নিজেই নোটীস দিতিস্।

যন্ত্রণা যন্ত্রণা—এরাও কেউ ওর যন্ত্রণা লাঘব করবে না একটুও। ঠিক আছে, ও কোথায় উঠতে পারে সকলে দেখবে, এরাও দেখবে।

অবাঙালী পাড়ায় ছোটো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে শক্ত কঠিন মুখে রমা মিত্র সেখানে উঠে এলো।

···প্রথম ছবি রিলিজ হল।

রমা মিত্র মরে গেল। ছবিতে এক মালবী মিত্রের আবির্ভাব দেখল সকলে। প্রথম ছবিতে এমন বিপুল বন্দনা কম নায়িকার ভাগ্যেই জুটেছে।

ওই প্রথম ছবির মুক্তির দেড় মাসের মধ্যে পর পর আরো চারখানা ছবির কন্ট্রাক্ট সই করেছে—দশ হাজার থেকে বিশ হাজার দাম তুলতে পেরেছে অক্লেশে। প্রথম ছবির মুক্তির আড়াই মাসের মধ্যে আগের কন্ট্রাক্টের দ্বিতীয় ছবির আবির্ভাব। তখনো প্রথম ছবি পুরো মৌসুমে চলেছে—দ্বিতীয় ছবি আরো সফল।

এই সাফল্যের মুখে নিদারুণ ব্যাপার ঘটে গেল একটা। এক সন্ধ্যার মুখে কাজল বাড়িতে এসে উপস্থিত। ওকে দেখেই রমার বুকের ভিতর মোচড় পড়ল একটা। ছুটে গিয়ে ওকে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু মান-অভিমানের প্রাচীর সরানো গেল না। তাছাড়া ওকে দেখেই কেমন মনে হল ও দিদির টানে আসেনি, কিছু একটা স্বার্থ নিয়ে এসেছে।

তবু সাদরেই ডাকল, আয় দিদিকে তো ভুলেই গেছিস তোরা।

কাজল হাসল। জবাব দিল, তোকে ভুলব কি, তুই একটা মস্ত ফিগার এখন।

—ফাজলামো করতে হবে না। বাবার শরীর কেমন।

—ভালো।

—আর বাদলের ?

—সে তো চিরকালই ভালো। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো বরফে ঢাকা মানুষ। ···তবে দিনকতক আগে গলা ধাক্কা দিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে বলেছিল।

রমা ভুরু কুঁচকে ওকে নিরীক্ষণ করল একটু। মুখখানা শুকনো। —কেন? আগের থেকেও আরো বাড় বেড়েছে বুঝি তোর?

—তা না, বাবার নাম করে তার এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম—ভয়ানক দরকার পড়ে গেছল, না নিয়ে উপায় ছিল না। পরে বন্ধুর কাছ থেকে খবরটা জেনে বাবা দাদাকে বলেছিল কথাটা। শোনামাত্র দাদা এমন ক্ষেপে গেল, যদি দেখতিস—

ক্ষেপে না যাক, রমাও রেগেই গেল। —তোকে ধরে মারাই উচিত ছিল, কেন এ-ভাবে বাবাকে কষ্ট দিস?

ক্লান্ত মুখে কাজল মাথাটা কুশনে এলিয়ে দিল, দেখ, দিদি, নীতি কথা শুনতে আমার কোনদিন ভালো লাগে না। ঝকঝকে সাজানো ঘর দুটোর চারদিকে তাকালো একবার। —তুই তাহলে খুব ভালই আছিস এখন?

ভিতর থেকে একটা বিরক্তি ঠেলে উঠেছে। জবাব দিল, হ্যাঁ আছি।···বাবা আমার কথা কিছু বলে?

—না।

—আর বাদল তো বলেই না, কেমন?

—না। এক পেয়ালা চা আনতে বল্ তো।

একটা উদ্গত অভিমান বুকের ভিতরেই ঠেলে দিল রমা; —আর কি খাবি?

—খিদে পেয়েছে, যা দিবি তাই খেতে পারি। কিন্তু খাওয়ার থেকেও জরুরী দরকার আছে তোর সঙ্গে। কিছু টাকা দিতে পারিস?

এক মুহূর্তে ভিতরটা যেন বিষিয়ে গেল রমার। দিদির টানে নয়, শুধু এই স্বার্থ নিয়েই ও এসেছে। না, টান ওর ওপর কারোর নেই। মুখে কঠিন রেখা পড়তে লাগল।

—টাকা কি হবে?

—সত্যি বলছি দিদিভাই, খুব দরকার। পরে একদিন জানতে পারবি। দিবি?

—কত টাকা?

—হাজার আড়াই হলে ভালো হয়। তোর তো এখন অনেক টাকা, দিয়ে ফেল না।

টাকার অঙ্ক শুনে রমার মাথা আরো গরম হয়ে গেল। ভাইকে ও স্বার্থপরই ভাবে। যে দলে মিশেছে তাদের জন্যেই টাকার দরকার নিশ্চয়। বলল, বাবার মত না নিয়ে আমি এক পয়সাও দেব না।

কাজল সোজা হয়ে বসল। বিরক্ত মুখ।—বাবা মত দেবে কিনা সে তো খুব ভাল করেই জানিস। টাকাটা সত্যি খুব দরকার আমার।

—তোর দরকারের কথা আমি শুনতে চাই না। রমা ঘর ছেড়ে চলে গেল। আয়াকে চা করতে বলে নিজের হাতে এক প্লেট খাবার সাজিয়ে আবার ঘরে ঢুকল।

ঘরে কেউ নেই।

খাবারের ডিশ হাতে রমা দ্রুত বাইরের বারান্দায় এলো। ওপর থেকে দেখল ও চলে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ ঝাঁঝে ডেকে উঠল, কাজল!

কাজল ঘুরে দাঁড়াল। হাতের খাবারের ডিশ দেখল। অম্লান বদনে জিজ্ঞাসা করল, টাকা দিবি?

আরো আগুন হয়ে উঠল রমা।—না! তুই আসবি কি না?

কাজল চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। তারপর ঘুরে ঠাণ্ডা পদক্ষেপে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাগে আর অপমানে রমা কাঁপতে লাগলো।

এর সাত আট দিন পর সকালের কাগজ খুলতে রমা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল একটা। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। একটু সামলে নিয়ে খবরটা পড়তে চেষ্টা করল, সর্বাঙ্গ থরো থরো কাঁপছে।

কাগজের প্রথম পাতাতেই রক্তাক্ত মৃতদেহের ছবি একটা! তার নীচে খবর—অমুক শিল্পীর ছেলে কাজল মিত্রকে কে বা কারা খুন করে ফেলে রেখে গেছে। পুলিস হত্যাকারীর কোনো হদিস তখন পর্যন্ত পেয়ে ওঠেনি।

আরো কি বিবরণ লেখা আছে রমা পড়ে উঠতে পারল না। কাগজ হাত থেকে পড়ে গেল।

আসলে এটা দু'দিন আগের খবর। গত দিনের কাগজেও খুনের রিপোর্ট বেরিয়েছে, কিন্তু তখন পর্যন্ত দেহ সনাক্ত হয়নি। এই দিনে বিবরণ সহ পুলিসের কর্মতৎপরতার প্রত্যক্ষ ছবি বেরিয়েছে।

গাড়িটা কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে রমা কাঁপতে কাঁপতে বাবার বাড়িতে ঢুকল।...বাবা মেঝেয় বসে একটা কাগজে কি আঁকিঝুঁকি করছেন। মুখ তুললেন। মেয়েকে দেখলেন।

তাঁকে দেখেও রমা আঁতকে উঠল। চোয়ালের হাড় উঁচিয়ে আছে—চোখ দুটো গর্তে। অনেক দিনের অনিয়মে আর অযত্নে এ-রকম চেহারা হতে পারে।—আয়। ভালো আছিস?

রমার মনে হল বাবার গলার স্বরও কেমন বদলে গেছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে ওর।...ক'দিন আগে কাজল টাকা চেয়ে না পেয়ে অভুক্ত ফিরে গেছে। তখন কি কল্পনা করতে পেরেছে এমন একটা অসহ্য ব্যাপার ঘটে যাবে।

বাবা চুপ। হাতের পেন্সিল কাগজের উপর দাগ কেটে চলেছে। ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন না। একটু বাদে তাঁর মুখ থেকেই, রমা বলল, ব্যাপারটা ঘটে গেছে দু'দিন আগে। গত সন্ধ্যায় কাজলের দেহ দাহ হয়ে গেছে!

...বহুক্ষণ, প্রায় ঘণ্টাখানেক নির্বাক কেটে গেল তারপর। রমা একসময় ও-দিকের চিলতে ঘরের দিকে তাকালো। ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করল, বাদল কোথায়?

বাবা জবাব দিলেন, ও-ঘরে।

এত বড় শোক আর দুঃসহ যন্ত্রণা সত্ত্বেও রমার মনে হল, ও এসেছে জানা সত্ত্বেও এতক্ষণের মধ্যে বাদল ও-ঘর থেকে এ-ঘরে উঁকি দিল না একবার। নিজেই উঠল আস্তে আস্তে। এ-ঘরে এলো।

বাদল একটা দড়ির খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। এই খুপরি ঘরেও দৈন্যের ছাপ প্রকট! কিন্তু বাদলের সেই চিরাচরিত ঠাণ্ডা মুখ।

মনের এই অবস্থাতেও রমা তেতেই উঠল।—আমি আর তোদের কেউ নই, তাই না রে বাদল?

বাদল একবার মাথা উঁচিয়ে দেখল ওকে। তারপরে উঠে বসল। ···আয়, বাবার কাছে বসে আছিস দেখে ডিস্টার্ব করিনি।

রমা ক্ষোভে ভেঙে পড়ল, তোর মস্ত অহংকার তুই কাউকে ডিস্টার্ব করিস না—এ অহংকার না থাকলে কাজলকে তুই ফেরাতে পারতিস, বাঁচাতে পারতিস।

জবাবে বাদল ওর দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বলল, আমার ক্ষমতা কতটুকু আমার জানা আছে, তবু চেষ্টা করেছিলাম ···তোর কাছে যেতে বলেছিলাম···তুই টাকা ক'টা ওকে দিলে কি হত বলা যায় না···হয়তো বাঁচতে পারত।

রমা বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তারপর অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। —তুই পাঠিয়েছিলি কাজল সে-কথা বলল না কেন? টাকা ও কিজন্যে চেয়েছিল?

—এ জায়গা ছেড়ে পালাবার জন্যে।···বিপদ আসছে ও বুঝতে পেরেছিল। এই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে ছোট-খাট কিছু ব্যবসা-ট্যবসায় মন দেবে বলেছিল।

রমার বুকের ভিতরটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে যাবে বুঝি। নির্বাক আর্ত চোখে ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

বাদল নির্লিপ্ত গম্ভীর। উঠে জামাটা গায়ে পরল। বলল, একটু বেরুতে হবে, দরকার আছে।

চলে গেল। রমার ভিতরটা হাহাকার করে তাকে ডাকতে চাইল, বাদল, দাঁড়া—আমার কথা শোন্, আমাকে এত হীন এত স্বার্থপর তোরা ভাবিস না! কিন্তু ডাকা গেল না। গলা দিয়ে একটা শব্দও বার করা গেল না।

রক্তাক্ত ক্ষত বুক নিয়ে রমা নিজের ডেরায় ফিরে এলো আবার। ···কিন্তু সেই রক্তও শুকলো আবার। ও থেমে গেল না। ওর ভিতরকার সেই অসামান্য মেয়েই তার ওপর দখল নিল আবার। বড় হওয়া বিধিলিপি। অনেক, অনেক বড়। সেই রাস্তা দিনে দিনে সুগম হয়ে উঠছে।

সেই সময় হঠাৎ একদিন কি মনে হতে নিজের গাড়িতে চেপে সুমিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু দেখা হয়নি। তার বাড়ির লোক ওকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সে সাধারণ মেয়ে রমা মিত্র নয়, অসামান্য মেয়ে মালবী মিত্র। মালবী মিত্র শুনল, সুমিতা এখানে নেই, অবনীশ বিলেত থেকে ফিরেই ভাইজাগে পোস্টেড হয়েছে—সুমিতাকে নিয়ে সেখানেই আছে।

…তিন বছরের মাথায় তার অভিনয়ের দাম উঠেছে পঁচাত্তর হাজার। ছবি যারা করছে তাদের সে-টাকা দিতে আপত্তি নেই। টাকা ফেললেই যদি নিশ্চিত টাকা আসে তবে তারা কার্পণ্য করবে কেন? এই দামে উঠেও রমা মিত্রর তাই বছরে কম করে চার পাঁচটা কণ্ট্রাক্ট সই না করে অব্যাহতি নেই। …সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে নিজের গাড়িতে ফিরছিল। হঠাৎ লাইট-পোস্টের সামনে একজনকে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিষম চমকে উঠল।

—ড্রাইভার, রোখো রোখো!

গাড়ি থামতেই শশব্যস্তে নেমে বাসস্টপের ওই একজনকে হাত ধরে টেনে সোজা গাড়িতে এনে তুলল। ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার উপায় নেই। মালবী মিত্রকে চিনে ফেলা মাত্র রাস্তার লোক ছেঁকে ধরবে। তাদের চোখের ধোঁকা কাটার আগেই গাড়ি স্টার্ট দিল আবার।

—বাদল তুই! …এই চেহারা…বাবা…?

বাদলের মাথার চুল বড় জোর এক ইঞ্চি—মাথা কামানোর কিছু সময় বাদে যেমন হয়।

বাদল ঘুরে দেখল ওকে। তার চোখেই যেন অবাক হবার মতো কিছু নেই কোনো সময়। কাজলের সেই দুর্ঘটনার পর আরো বার দুই বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছল। তখন অনেক বাইরের লোক ভিড় করে এসেছিল সেখানে। বাবা বলেছিলেন, এখানে তোর আর না আসাই ভালো, দেখতেই তো পাচ্ছিস…।

একটা প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে ফিরে এসেছিল রমা—রমা নয়,

মালবী মিত্র। এক ভাইও সেদিন যেন সকৌতুকে ওকে দেখেছিল শুধু। একটি কথাও বলেনি। তারপর এই দেখা।

বাদল জবাব দিল, বুঝতেই তো পারছিস নেই।

—নেই! বাবা নেই? একটা কান্না ঠেলে বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।—বাবা নেই আর তুই আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলি না?

বাদল বলল, দিতে চেয়েছিলাম···বাবাই বলল, কি হবে ওকে বিরক্ত করে। ভালো থাকলেই হল।

স্তব্ধ নির্বাক অনেকক্ষণ। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে মালবী মিত্রর নামে···আর কত টাকা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে ব্যাঙ্কে রাখার উপায় নেই বলে। কিন্তু এ-যাবত একটি কপর্দকও বাবা নেয়নি। দিতে গেলে বলেছিল, তোরটা তোর কাছেই থাক। ···বাদলের মুখখানাও শীর্ণ, ঠিকমতো খাওয়া জোটে কিনা সন্দেহ।

···কবে গেছেন?

—মাস দেড়েক হল।

—তুই কি করছিস এখন?

—রাতে একটা টিউশনি, আর সকালে এক উকিলের দপ্তরে মুহুরীগিরি।

খুব সহজ মুখেই জবাবটা দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমাকে তুই টেনে নিয়ে চললি কোথায়?

—জানি না। ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে কেমন।—আমার মুখও আর তোর দেখতে ইচ্ছে করে না, দিদি বলে আর কাছেও আসতে ইচ্ছে করে না—তাই না বাদল?

বাদল হাসছে। জবাব দিল, মালবী মিত্রর মুখ দেখতে পাওয়া এখন কি চাট্টিখানি কথা! এই হতভাগা হ্যাভ-নট্ মুখ দেখতে গেলে তুই-ই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে যাবি বোধহয়। ছেলেটার পরীক্ষা আসছে, নামব···ড্রাইভারজি রোখো।

গাড়ি থামল। বাদল নেমে চলে গেল।

আরো প্রায় চার বছর বিগত। অর্থাৎ অভিনয় জীবনের সপ্তম বছর অতিক্রান্ত প্রায়। মালবী মিত্রের অমোঘ আবির্ভাব দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হয়েছে। এখন দেশ জুড়ে মালবী মিত্র একটা নাম। সে অসামান্যা। এখন কন্ট্রাক্ট-এর দাম এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। তাতেও কাড়াকাড়ি তাকে নিয়ে। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই।

ক'টা ছবির কাজ একসঙ্গে শেষ হতে মালবী একটু হাঁপ ফেলেছিল। এরই মধ্যে দ্বিগুণ মূল্যে এখানেই একটা হিন্দী ছবিও শেষ করে এনেছে। এখন নতুন কোন্ কোন্ ছবি হাতে নেওয়া যেতে পারে ভাবছিল। ধরছে তো এসে কত জনই। বম্বে থেকে ডাক আসছে, তাতেও সাড়া দেবে কিনা চিন্তা করতে হবে।

এমন দিনে আবার এক অভাবিত বিপর্যয়। সারদার হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে চোখের সামনে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যেন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। কেউ আসার দরুন। দিদিমণির মুখের এমন পরিবর্তন সারদা আর কখনো দেখেনি বোধকরি।

চিরকুটে শুধু একটা নাম লেখা। প্রশান্ত ঘোষ।

সেই পুরনো জ্বালা আর অনুভূতিটা নতুন করে ক্ষত সৃষ্টি করল যেন হঠাৎ। সেটা সামলে নিয়ে সারদাকে হুকুম করতে সময় লাগল। তারপর হুকুম দিল, বলে দে দেখা হবে না।

সারদা দ্রুত প্রস্থান করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মত বদলালো মালবী মিত্র। —সারদা শোন—

আয়া অর্ধেক সিঁড়ি থেকে ফিরে এলো।

বলল, এখানে নিয়ে আয়।

বিমূঢ় মুখে সারদা আবার ছুটল।

একটা শোবার ঘর। মালবী মিত্র উঠে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল একবার। কিন্তু কিছুই করল না, চিরুনিটাও হাতে নিল না। ঘরের চারদিকে তাকালো একবার। দেয়ালে দেয়ালে তারই নানা

ঢংয়ের ছবি। নিভৃত অবকাশে বিস্রস্তবসনা ফোটোও আছে।

মালবী মিত্রর মনে হল চোখে মুখে একটু জল দেওয়া দরকার। চোখ দুটো ভয়ানক জ্বালা করছে, আর মুখটাও কেমন খরখরে হয়ে আছে। ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে গেল। সহজ—খুব সহজ হওয়া দরকার। সহজ হবার এত তাগিদ অভিনয় করার সময়ও কখনো বোধ করেছে কিনা সন্দেহ।

চোখে মুখে বেশ করে জলের ঝাপটা দিয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে নিঃশব্দে দরজা খুলল। সারদা তাকে ঘরে এনেছে। ও-দিক ফিরে দেয়ালের ফোটোগুলো মন দিয়ে দেখছে। পিছন থেকে মনে হল একটু মোটার দিকে ঘেঁষেছে।

—হ্যালো। হোয়াট এ সারপ্রাইজ। মালবী মিত্রর গলার স্বরে নিখুঁত হাল্‌কা ভাঁজ পড়ল।

প্রশান্ত ঘুরে দাঁড়াল। তারপরেই একটা উদ্‌গত আবেগে কাছে এগিয়ে এলো। তারপর আবার থমকে দাঁড়াল।

—বোসো বোসো। একটু ঘুরে মালবী মিত্র হাতের তোয়ালেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কোথায় গিয়ে পড়ল সেটা চেয়েও দেখল না। —বাইরেটা এই সাত বছরে কিছুই বদলায়নি দেখছি—বিলেত থেকে এ আর কি সাহেব হয়ে এলে। বোসো—।

নিজে ধুপ করে দামী পালংকের উপর বসে পড়ল। সামনের গদি-আঁটা চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে প্রশান্তও বসল।

…সেই মুখ, সেই পুরু কাঁচের চশমা, মাথায় সেই রকমই ঝাঁকড়া চুল, ঠোঁটের ডগায় সেই কাঁচা দুষ্টুদুষ্টু হাসি—না মালবী মিত্র চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছে না। রাগে সর্বাঙ্গ চিনচিন করে জ্বলতে শুরু করেছে আবার।

প্রশান্ত দু'চোখ ভরে দেখল তাকে খানিক।…কেমন আছ রমা?

—রমা। হেসে উঠল।—রমা আবার কে? আমি তো মালবী।

এবার প্রশান্ত ঘোষও হেসে উঠল। বলল, কি ফ্যাসাদেই যে ফেলেছিলে এই নাম নিয়ে—যাকে সকলে চেনে সেই আসল মেয়েকে

কেউ চেনে না। বাইরে থেকে ফিরে এই একটা মাস কি খোঁজাই না খুঁজেছি তোমাকে। শেষে সুমিতার কাছে শুনলাম তুমি এখন দেশের উজ্জ্বলতম তারকা মালবী মিত্র।...বিলেত থেকেও তোমাকে কত যে চিঠি লিখেছি, জবাব না পেয়ে শেষে হাল ছেড়েছি।

...বাড়ি তো সেই কতকাল ছেড়েছিল, চিঠি সত্যিই লিখে থাকলেও পাবার কথা নয়। পেলেও জবাব দিত না। এই কাঁচা মিষ্টি মুখ দেখে মনে হয় না এও বেশ অভিনয়ে রপ্ত হয়েছে। চোখে চোখ রেখে মালবী চেয়েই আছে।

—কি দেখছ।

—তোমাকে। প্রশান্ত হাসল আবার, সুমিতার মুখে তো তোমার কাণ্ড শুনে আমি হাঁ। এখানে এসেও দেখছি তুমি অসাধ্যসাধন করেছ। তোমার ট্যালেন্ট-এর আসল আবিষ্কারক আমি মনে আছে?

—আছে। মালবী নিষ্পলক চেয়ে আছে।

—কিন্তু তোমাদের আধুনিক ছবিতে চিত্রাঙ্গদা অচল নিশ্চয়?

মালবী জবাব না দিয়ে সামান্য মাথা নাড়ল শুধু। চোখ দুটো আবার জ্বালাজ্বালা করছে, সহজতায় চিড় খাচ্ছে।

—ওর ভাগীদার না থাকাই ভালো।...কিন্তু আমি মিথ্যেই সাত সাতটা বছর টাকার জন্যে পৃথিবীর আধখানা চষে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করলাম, তুমিও সারপ্রাইজ দিয়ে পরে চিঠি লিখেছ নিশ্চয়—কিন্তু উপায় ছিল না। টাকার চিন্তায় দেশে থাকতে অনেক ভুগেছি, তাই সুখে থাকার জন্য ও-ব্যাপারে নিষ্কণ্টক হতে চেয়েছিলাম।

মালবী কি করবে—ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে লোকটাকে? তার মুখের ওপর থেকে দু'চোখ নড়েনি একটুও। আরো একটু ধৈর্য ধরা যেতে পারে।—অনেক টাকা করেছ?

—ভেবেছিলাম মন্দ করিনি। সুখেই কেটে যাবে, কিন্তু তখন কি ছাই জানি তুমি আমার ওপর কয়েকগুণ টেক্কা দিয়েছ—মিথ্যেই এতগুলো বছর নষ্ট।

চোখে চোখ রেখে মালবী অপলক চেয়ে আছে।—একা ফিরেছ

না মেম-বউকে এনেছ ?

প্রশান্ত অবাক।—মেম বউ ?

—সে ছেড়ে গেছে তাই এখন আবার নতুন করে সুখে থাকার কথা ভাবছ ?

বিমূঢ় মূর্তি।—কি বলছ তুমি ?

ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এমন নির্লজ্জও মানুষ হয়। ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাদের কাঁধে হাত রাখা যুগল ছবি আমি দেখেছি, আর তোমার মা-কে লেখা তোমার সেই চিঠিও আমি পড়েছি।

প্রশান্তর দু'চোখ বিস্ফারিত প্রথম। তার পরেই হা-হা হাসি। সেই সহজ স্বচ্ছ সরল হাসি শুনে মালবী মিত্র ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল কেন যেন। কি এক অনাগত বিপর্যয় যেন তার মাথার ওপর দ্যুত। হে ভগবান, এ হাসি মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক।

—সে-সব তুমিও বিশ্বাস করেছ নাকি! প্রশান্ত ঘোষ সাত বছর আগের ঠিক সেই ছেলেমানুষই।—কি আশ্চর্য! আমার প্রত্যেক বারের প্ল্যান তুমি বাতিল করেছিলে—তাই বিলেতে গিয়েই বাবাকে জব্দ করার মোক্ষম প্ল্যান ফেঁদেছিলাম। বাবার ওপর আমার তখন দুনিয়ার সব থেকে বেশি রাগ—আর, কাঁধে হাত রেখে ছবি তোলার মতো অন্তরঙ্গতা ও-দেশে একটু চেষ্টা করলে হয়—আমাকে অবশ্য একটু বেশিই কষ্ট করতে হয়েছিল, কারণ অবনীশকে পর্যন্ত ভাঁওতা দিয়ে চলতে হয়েছিল।...কিন্তু আশ্চর্য! সকলকে ছেড়ে তুমিও কিনা সত্যি ভেবে মন খারাপ করেছিলে! আবার হা-হা হাসি।—এতবার আমার কাঁচা প্ল্যান বাতিল করার পর তুমিও এটা ধরতে পারবে না ভাবিনি কিন্তু—তাছাড়া চিঠিতে তো আমি লিখেওছিলাম সব কথা, সে-চিঠিও তুমি পাওনি দেখছি!

মুহূর্তের মধ্যে এ কি হল মালবীর! মাথাটা এমন প্রচণ্ডভাবে ঝিমঝিম করে উঠল কেন ? প্রাণপণে এই কথাগুলো ভণ্ডামী ভাবতে চেষ্টা করল কেন ? তার ঘরে এত আলো, অথচ রাজ্যের অন্ধকার ভিড় করে আসছে কেন ?

প্রশান্তও তার দিকে চেয়ে এবারে বিস্মিত একটু।—কি হল?

প্রাণপণে মালবী সামলে নিতে চেষ্টা করল নিজেকে।—বিশ্বাস করতে বলছ?

—কি মুশকিল, আমি বলছি তাও বিশ্বাস করবে না? যাবার আগে কি বলে গেছলাম ভুলে গেছ?

মালবী দেখছে তাকে। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

—তারপর আবার কি, এবারে বিয়ে। বাবা তো আর নেই, আর মায়ের যা অবস্থা, তোমাকে ঘরে আনতে পারলে বাঁচেন। তাঁর সঙ্গে আমার সাফ কথা হয়ে গেছে।

খাট মাটি বাড়ি ঘর সব দুলছে মালবীর চোখের সামনে। তবু হাসি হাসি মুখেই বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি যে অভিনেত্রী হয়েছি।

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশান্ত বলল, কথা যদি রেখে থাকো, মানে আমার জন্যে প্রতীক্ষা যদি করে থাকো তাহলে আর কোনো কিছুতে আসে যায় না।

খাট মাটি ঘর দুয়ার আর একবার বিষম দুলে উঠেছে। তারপর মালবী হেসেছে—হেসে উঠতে পেরেছে। এত সুন্দর হেসেছে যে, যে-কোনো পরিচালক অবাক হয়ে যেত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি যেন মনে পড়েছে। চট করে উঠে ঘড়ি দেখেছে।—এই রে, আটটা বাজে, সাড়ে আটটা থেকে নাইট শূটিং আমার—কি মুশকিল যে হল চার-চারটে দিন এখন ভয়ানক ব্যস্ত থাকব।—দু'দুটো ছবি শেষের মাথায়—সকালে রাত্রিতে দু'দফা করে শূটিং, এর মধ্যে দু'দণ্ড মাথা ঠাণ্ডা করে কিছু ভাবার সময় সেই। তুমি এই চারটে দিন বাদে এসো, লক্ষ্মীটি—

জবাব না দিয়ে প্রশান্ত চুপচাপ মুখের দিকে চেয়েছিল। তাইতেই যেন আরো বিড়ম্বনা। সেই চাউনি, সেই মুখ—কে বলবে এই মানুষ টানা সাত বছর বিদেশের মাটি চষে, মস্ত মস্ত চাকরি করে কিছুদিন আগে দেশে ফিরেছে। মালবী এই মুখ আর চাউনি দেখে ভাবতে পারে বড় জোর সাত মাস দেখেনি মানুষটাকে।

নিরুপায় ভ্রূভঙ্গি করে মালবী আবার হেসে বলল, এই দেখো না, এতকাল বাদে তোমাকে দেখে কি-যে করব ভেবে পাচ্ছি না, অথচ দুটো ঘণ্টা তোমাকে বসিয়ে আদর-যত্নও করতে পাচ্ছি না···কি-যে জীবন হয়েছে আমার যদি জানতে। যাক্, চারদিন পরে তুমি ঠিক আসছ কিন্তু। তখন সব শোনা যাবে, ভাবা যাবে।

পুরু কাঁচের পিছনে ওই দুটো চোখ তার মুখের ওপর অপলক খানিক।—নতুন করে কিছু শোনার বা ভাবার আছে নাকি?

মালবী ফাঁপরে পড়ল।—ও মা নেই। সাত বছর বাদে তুমি হুট করে হাজির হবে জানব কি করে! কতগুলো কণ্টাক্ট সই করা আছে কে জানে—

প্রশান্ত চেয়ার ছেড়ে সামনে এগিয়ে এলো। কিছু একটা ব্যতিক্রমের আভাস পাচ্ছে কিনা বুঝছে না।—এই! তোমার ভুল হয়েছিল বলে না আর কোনরকম বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে?

—আর আবার কি বাধা!···ও! আবার হেসে উঠল। তা সাতটা বছর তো কম নয়, যদি বাধা উপস্থিত হয়েই থাকে? সাত বছর কেন, সাত ঘণ্টা আগের সেই দুরন্ত মানুষ যেন হঠাৎ খপ করে তার দুই কাঁধ ধরে তেমনি আসুরিক আবেগে আচমকা দখল নিয়ে বসল তার ওপর।···কিন্তু না, ছেড়ে দিল তারপর। বলল, বাধা উপস্থিত হলে কি করে আমি সেটা ছেঁটে দিতে পারি তোমার জানা নেই?

মালবী মিত্রর বুকের ভিতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু আরো বেশি হাসতে পারছে।—তুমি সেইরকমই পাগল আছ দেখছি। যাক, এতকাল কেটেছে আর চারটে দিন ধৈর্য ধরো তারপর এসো। রাগ করলে না তো? ঠিক এসো কিন্তু—

—আসব। নিজের গরজেই আসব।

বলল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু যেন ব্যতিক্রমের কাঁটা বুকে নিয়েই সে চলে গেল।

ট্রেনের রিজার্ভ কামরার পুরু গদিতে ঠেস দিয়ে বাইরের দিকে

চেয়ে বসে আছে মালবী মিত্র। বাইরের গাঢ় অন্ধকারের পাতাল ফুঁড়ে ট্রেন ছুটেছে। ওটা আলোয় পৌঁছুবে। কিন্তু মালবী কোথায় ছুটছে? সে অন্ধকার খুঁজছে। কোনো অস্তিত্বগ্রাসী অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবার তাড়না তার। কিন্তু এমন জায়গা আছে কি···

সামনের বার্থে শুয়ে সারদা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মনিবানীকে হঠাৎ এ-ভাবে পড়ি-মরি করে বেরিয়ে পড়তে দেখে সে ততো অবাক হয়নি যত হয়েছে টানা তিনটে দিনের থমথমে মুখ দেখে।

একবার তাকে দেখে নিয়ে অবসরের মতো আবার বাইরের দিকে ফিরল মালবী মিত্র।

··সাত বছর বাদে ওই প্রশান্ত এসেছিল কোনো একদিনের সাধারণ মেয়ে রমা মিত্রর কাছে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছে এক অসাধারণ মেয়ে মালবী মিত্র। যার তুলনা নেই। যার দেখা পেলে বহু রসিকজন ভাগ্য মানে। খ্যাতির বিড়ম্বনায় যে মালবী মিত্র সর্বসাধারণের নাগাল থেকে বিচ্ছিন্ন—মিনিট চল্লিশ সেই মালবী মিত্র অভিনয় করেছিল প্রশান্তর সঙ্গে—রমা মিত্র নয়···প্রশান্ত কি তা বুঝেছে? বুঝে গেছে? বোঝার কথা, মালবী মিত্র চেষ্টাও করেছে—কিন্তু মানুষটা সেই চিরকালের মতোই অবুঝ।

···তাকে ঠেকানো যাবে না, মালবী মিত্র না পালিয়ে কববে কি?

···এই রাতটা পোহালে চার দিনের অবসান। কালই বিকেলের দিকে প্রশান্ত আবার আসবে। ঢোকবার সময় বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ দেখে থমকে দাঁড়াবে। পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে বাড়িটার সর্বত্র দেখবে। আর তারপর তালাবন্ধ দরজার সামনে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়েই থাকবে।

মালবীর ঠোঁটের ডগায় কৌতুকের মতো রেখা ফুটল একটু। কিন্তু চোখ অস্বাভাবিক চিকচিক করছে। বিগত এই ক'টা বছর শিল্পের তাগিদে ঠোঁটে তার অজস্র কৌতুক ঝরেছে, আর চোখ দুটো তার অজস্রবার চিকচিকিয়ে উঠে দুই গাল বেয়ে ধারা নামিয়েছে।

···কিন্তু এর সঙ্গে সে-সবের মিল নেই।

…আজই তার পালাবার তাড়া, কারণ প্রশান্ত যা-ই বুঝে গিয়ে থাক, আসবেই সে কাল।

…আর কারণ, মালবী মিত্র তার মন দিয়ে বুঝেছে প্রশান্ত এক বর্ণও মিথ্যে বলেনি।

…আর কারণ…মালবী তার জন্য প্রতীক্ষা করেনি। অসামান্য হয়ে ওঠার দুর্বার তাগিদে তার যৌবনে বাস্তবে একাধিক পুরুষের অভ্যর্থনা ঘটে গেছে—মালবী মিত্র এতটুকু পরোয়া করেনি।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে ট্রেন ছুটেছে! আলোয় পৌঁছুবে। কিন্তু সে ছুটেছে তেমনি অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দেবার তাড়নায়।… রমা মিত্রর ভস্ম থেকে একদিন মালবী মিত্র উঠে এসেছিল। এবার মালবী মিত্র ভস্ম হয়ে গেলেও এ জীবনে আর রমা মিত্রর হদিস যেন না মেলে এটুকুই শেষ কামনা।

মালবী মিত্র হারিয়ে গেল সেটা চিত্র জগতের বিস্ময়। পত্র পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক রকমের গবেষণা হয়ে গেল। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারপর জনচিত্ত ওই একটা নাম ভুলতে বসল।

ভুলতে পারল না শুধু একজন। প্রশান্ত ঘোষ।

মালবী মিত্র হারিয়ে যেতে পারে, কারণ প্রশান্তর কাছে তার অস্তিত্ব নেই। রমা মিত্র হারাবে কেমন করে?

রমা যা ভেবেছিল, তাই! বাড়িঘর সব বন্ধ দেখে প্রথমে অবাক হয়েছে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছে। পর পর ক'দিনই এসেছে তারপর। ভেবেছে, শূটিং-এ হঠাৎ বাইরে-টাইরে চলে গেছে কোথাও। তার রাগ হয়েছে, অভিমান হয়েছে, কিন্তু তখনো মাথায় কোনো নিরুদ্দেশের সম্ভাবনা ঠাঁই পায়নি! ভেবেছে, আগের থেকে প্রোগ্রাম থেকে থাকলে না গিয়ে করবে কি, সে তো আগে থাকতে জানান দিয়ে আসেনি! তবু রাগ হয়েছে, অবাক হয়েছে এই ভেবে,

রমা তাকে চারদিন বাদে আসতে বলেছে···তখনাই তার বরের প্রোগ্রামের কথা মনেও পড়ল না!

এই বিস্ময়টুকু নিরসন হবার আগেই কাগজে কাগজে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল! আর, একসময় সেটা প্রশান্ত ঘোষের গোচরে এলো।

লোকটা ভিতরে ভিতরে গোঁয়ার, অসহিষ্ণু, কিন্তু নির্বোধ নয়। সাত বছর বাদে প্রথম দর্শনে রমার দিকে চেয়ে আর তার আচরণে যে ব্যতিক্রম দেখেছিল তার হেতু ক্রমশ যেন বোধগম্য হয়ে উঠতে লাগলো।

···সাত বছর ধরে লোকটা সত্যিই অপেক্ষা করেছিল, বা, কথা মতো আবার ফিরে আসবে রমা বিশ্বাস করেনি। উল্টে, মেম সাহেবের সঙ্গে তার যুগল ছবি আর বাবা-মাকে ভাঁওতা-দেওয়া চিঠিটাই বিশ্বাস করেছিল।···তাহলে?

সুমিতার সামনেই অবনীশকে জিজ্ঞাসা করেছে, তা হলে?

ওর উদ্‌ভ্রান্ত হাব-ভাব চাল-চলন দেখে সুমিতা আর অবনীশ ঘাবড়াতে শুরু করেছে। প্রশ্ন শুনে আরো অস্বস্তি।

প্রশান্ত আবার জিজ্ঞাসা করেছে, রমা বিশ্বাস করেনি আমি সাত বছর ধরে ওর আশায় দিন কাটিয়েছি, কথা-মতো অপেক্ষা করেছি—বিশ্বাস করেনি আমি মেম বিয়ে করিনি—তাহলে কি দাঁড়াল?

সুমিতা এই প্রসঙ্গ বাতিল করতে চেয়েছে। এ-সব ভেবে আর কি হবে প্রশান্তদা, রমা ভুল করে নিজের রাস্তা বেছে নিয়েছে তুমি তার কি করবে···তুমিও তোমার নিজের রাস্তায় চলো।

—দাঁড়া, দাঁড়া, রমা নিজের রাস্তা বেছে নিয়েছে···সেটা কি রাস্তা? জানিস কিছু?

সঙ্গে সঙ্গে একটা দিনের সেই বিলিতি ছবি ভাঙার পরের দৃশ্যটা মনে পড়েছে অবনীশ আর সুমিতার।···রমার সেই সাজ-পোশাক অন্যরকম, পাশে এক শৌখিন ভদ্রলোক—হাসি মুখে রমা অবনীশকে নাম ধরে ডেকেছিল।

—কি রাস্তা আমি কি করে বলব! সুমিতার ফাঁপরে পড়ার দাখিল।

ঘোরালো ধারালো চোখে প্রশান্ত ওর দিকে চেয়েছিল খানিক।

বিড়বিড় করে বলেছে, আমি জানি কি রাস্তা···আমাকে বিশ্বাস করেনি, আমি কথা রেখে ফিরে আসব ভাবেনি···তাই আমার জায়গায় অন্য লোক এসেছে।···কিন্তু এ-ভাবে পালিয়ে যাবার অর্থ কি ?

দিনকতক বাদে আবার এসেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। মুখের হাসিটা অস্বাভাবিক। কাছাকাছি বসতে একটা উগ্র গন্ধও নাকে এসেছে সুমিতার। প্রশান্ত বলেছে, স্টুডিও মহলে ঘুরে ঘুরে খবর-বার্তা নিলাম। এক-একখানা ছবির কণ্ট্রাক্ট করলে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পেত তোদের মালবী মিত্র···অমন-আকাশ-ছোঁয়া দাম আর কারো নয়। ওই তারকা হারিয়ে তারা বিস্ময়ে হাবুডুবু খাচ্ছে আর হাহাকার করছে।···কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে সে কোথাও গেছে এমন হদিসও মেলেনি···কেবল ওর সঙ্গে তার একটা পুরনো আয়া নিখোঁজ। শুনলাম ব্যাঙ্কে সেখানে যা ছিল তাও তুলে নিয়ে গেছে।···তা কত টাকা হবে বলে তোর ধারণা ?···বিশ বাইশ লক্ষ ? ভুল করলেও এ-ভাবে কে পালায় ? কেন পালায় ? তার সঙ্গে আর কারো পালানোর খবর শোনা যাচ্ছে না কেন ?

না সুমিতা বা অবনীশ জবাব দিতে পারেনি, এ নিয়ে একটি কথাও বলতে পারেনি।

প্রশান্ত হা-হা শব্দে হেসেছে।—মেয়েটা বোকা, বুঝলি ? এখনো বুঝলি না কি হয়েছে ? ভুল করে সে কি খুইয়ে এ-ভাবে পালিয়েছে ?

অবনীশ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে। সুমিতার সমস্ত মুখ লাল।

প্রশান্তর আসল ক্ষতটা এত বড় হয়ে জিইয়ে রইল কেন সে নিজেও ঠাওর করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। এমন যদি হত, ভুলের বোঝা বুকে নিয়েই রমা এখানে বসে আছে, আর তার এই জীবন অপর কোনো পুরুষের দখলে চলে গেছে—তাহলেও প্রশান্ত ক্ষিপ্ত হত, কিন্তু ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় সেই ক্ষত একদিন না একদিন ভুলতেও পারত হয়ত। কিন্তু, প্রশান্তর নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, তা হয়নি, রমা মিত্রর ওপর কারো কায়েমী অধিকার ছায়াবিস্তার করেনি, সে শুধু ভুলের বোঝা কাঁধে নিয়েই সরে গেছে। প্রশান্ত ঘোষ বুঝুক না বুঝুক, তার

অবচেতন মন একটা সত্য যথার্থ উপলব্ধি করেছে—মালবী মিত্র যত বড় চিত্রতারকাই হয়ে উঠুক আর যত লক্ষ-লক্ষ টাকাই রোজগার করুক—ওই মালবী মিত্রর মধ্যে রমা মিত্র বেঁচে ছিল, বেঁচে আছে—আর ঠিক সেই কারণেই মালবী মিত্রকে এত অনায়াসে ছেঁটে দিয়ে রমা মিত্র নিরুদ্দেশ হতে পেরেছে।

কিন্তু প্রশান্ত ঘোষ সচেতনভাবে কখনো এই গোছের বিশ্লেষণে মগ্ন হয়নি। অসহিষ্ণু আক্রোশে ওই ক্ষতটাই লালন করেছে শুধু।

তবু এরই মধ্যে আর এক রমণীর পদক্ষেপ ঘটেছে তার জীবনে।

মল্লিকা।

মল্লিকা বিদুষী নয় রমা মিত্রর মতো, চাপা ভাবাবেগে ভেসে যাবার মেয়েও নয় তার মতো—মল্লিকা রূপসী। সেই রূপ স্নিগ্ধ যত না, তীক্ষ্ণ তার ঢের বেশি। নিজের এই পুঁজিটুকু সম্পর্কে মল্লিকা নিজেই সচেতন। কিন্তু মনের দিক থেকে দীর্ঘকাল ধরে নিজেও সে সুস্থ ছিল না খুব। এই অসুস্থতা নিজেরই অপরিণত বয়সের এক প্রকাণ্ড ভুলের ফসল। আর সেই কারণেই পুরুষ সম্পর্কে তার বিবেচনা কিছুটা অকরুণ, নিষ্ঠুর।

বড় লোক এক পাথর-ব্যবসায়ীর মেয়ে মল্লিকা। বাপের ব্যবসার দিকে নজর, মায়ের নজর স্বামীর টাকা আর নিজের পার্টি-টার্টির দিকে। মল্লিকার দাদা তখন বিদেশে। এই অবস্থায় সতের বছরের রূপসী মেয়ের নজরটা কোন্ দিকে কারোরই তেমন লক্ষ্য ছিল না।

সতের বছর বয়েসে, কলেজে পা দেবার আগেই মল্লিকা তার থেকে দশ বছরের বড় এক ছেলের প্রেমে পড়েছিল। আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে, সুপটু ছলা-কলার আশ্রয় নিয়ে সেই ছেলেই ওকে প্রেমে পড়তে বাধ্য করেছিল। মোট কথা মল্লিকার বিবেচনায় সেই বয়সের অনুভূতি বস্তুটা একনিষ্ঠ প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়। বয়েস ভাঁড়িয়ে চোখ-কান বুজে সেই ছেলের সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়েটাও সম্পন্ন করে বসেছিল। তারপর বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড। নাবালিকা মেয়েকে ফুসলে বিয়ে করার অভিযোগ নিয়ে মল্লিকার বাবা মা আদালতে

উপস্থিত হবার উপক্রম করেছিলেন। কিন্তু ওই সতের বছরের মেয়ের তেজ দেখেই শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিরত হয়েছেন।

বছর দেড়েকের মধ্যে মল্লিকা নিজেই সেই বিয়ে ভেঙেছে। ওকে ধরে রাখার মতো পদার্থ ছেলেটার মধ্যে সত্যিই কিছু ছিল না। বছর খানেকের মধ্যেই মল্লিকার মোহ ভেঙেছিল। সেই প্রেমিক তখন নানা অছিলায় ওর মারফৎ শ্বশুরের টাকার ওপর থাবা বসাচ্ছিল। শেষে মল্লিকা ফুঁসে উঠতে একদিন মারধর পর্যন্ত করে বসল।

ব্যস ফাঁক পেয়ে মল্লিকা সেইদিনই বাপের বাড়ি চলে এলো। আর যায়নি। তারপর যথাসময়ে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। বাপের পয়সার জোরে এ ব্যাপারেও তেমন বেগ পেতে হয়নি।

জীবনের এত বড় একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করে করতে হয় সে জানে না। তাছাড়া সেই ধৈর্য বা সহনশীলতাও নেই। পুরুষের ওপর সেই থেকে এক ধরনের অকরুণ আক্রোশই শুধু পুঞ্জীভূত হতে থাকল।

হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। মোটামুটি-ভাবে বি. এ-টাও পাশ করেছে। দু'চারটে প্রেমিক তখনো তার চার-পাশে ঘুর ঘুর করেছে। কিন্তু মল্লিকা তাদের ওপর অনায়াসে নির্দয় হতে পেরেছে। আর নির্দয় হতে পেরে ভিতরে ভিতরে এক ধরনের তৃপ্তিও পেয়েছে। মল্লিকার ছাব্বিশ বছর বয়সে প্রশান্ত ঘোষের সঙ্গে তার যোগাযোগ। এই যোগাযোগের পিছনে তার বিলেতফেরত দাদার একটু সক্রিয় প্রচেষ্টা ছিল।

প্রশান্তর সঙ্গে দাদার পরিচয় বিদেশে থাকতে। বয়েসে প্রশান্তর থেকে বছর কতকের বড়, বাইরের এক ফার্মের পদস্থ ব্যক্তি তখন। বাপের অঢেল টাকায় সে গা না ভাসিয়ে নিজের কর্মজীবন নিজে গড়ে তুলেছে। প্রশান্তকে তখন থেকেই সেই দাদাটির ভারী পছন্দ। কিন্তু তা বলে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো চিন্তা তার মাথায় তখনো আসেনি।

সেটা এসেছে কলকাতার কর্মস্থলে আবার তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যেতে। সেই দাদা এখানে তখন প্রশান্তর বন্ধু এবং ওপরওলা। অত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে বলেই একটিমাত্র বোনের জীবনটা

নষ্ট হয়ে যাবে, কোন শুভার্থীর সেটা কাম্য হতে পারে না। এখানে প্রশান্তকে পেয়ে তার হাতে বোনকে দেবার মতলবটা মাথায় এসেছে। মল্লিকার শুধু রূপের আকর্ষণ নয়, টাকার আকর্ষণেও কমতি যায় না। চোখ বোজার আগে তাদের বাবা মেয়ের নিশ্চিন্ত দিন যাপনের ব্যবস্থা করেই গেছেন।

রমা মিত্রকে খোঁজাখুঁজি করে প্রশান্ত যখন প্রায় হাল ছেড়েছে, মল্লিকার দাদা প্রায় সেই সময় থেকেই ওকে বাড়িতে টেনে আনা শুরু করেছে। প্রশান্তর অনেক আচরণ অবশ্যই বিসদৃশ লেগেছে তার তখন, আর মদের মাত্রাও বাড়তে দেখেছে। কিন্তু বিলেত-ফেরত সাহেব মানুষ সে-ও, ওটা বড় করে দেখেনি! বোনের কাছে প্রশান্তর অজস্র প্রশংসা করেছে, বাইরে থাকতে আর অনেক ছেলে-মানুষি মিষ্টি কাণ্ডর কথা বলেছে। আর শেষে খোলাখুলিই বোনকে জিজ্ঞাসা করেছে, একটা সম্পর্ক ঘটানোর চেষ্টা করবে কি না।

মল্লিকার আর যা-ই হোক, বয়েস ছাব্বিশ গড়াতে চলেছে। এ-ভাবেই জীবনটা কেটে যাবে তেমন কোনো সঙ্কল্প নিয়ে বসে ছিল না। একটু বরং হতাশার ছায়া পড়ছিল ভিতরে ভিতরে। এর মধ্যে ওই একজনকে দাদার ঘন ঘন বাড়িতে নিয়ে আসার আর তার এত প্রশংসা করার উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে পেরেছিল। তাই ওই মানুষকে সে ভালো করেই লক্ষ্য করেছে মন্দ লাগেনি। দাদার কথা অনুযায়ী ছেলে-মানুষি হাবভাব অবশ্য কিছুই চোখে পড়েনি। তবু কিছু একটা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি এড়ায়নি। হয়তো বা সেটা তার নির্লিপ্ত হাব-ভাব, আর নিঃসংকোচ গভীর চাউনি। সেই চাউনিটা এক এক সময় অদ্ভুত তীক্ষ্ণ মনে হয়েছে মল্লিকার, আবার কোনো সময় মনে হয়েছে বেদনামাখা। তাছাড়া দাদার ওপর একটু বিশেষ আস্থাও ছিল মল্লিকার। দাদা কারো সম্পর্কে একেবারে অযথা বাড়িয়ে বলার মানুষ নয়।

মল্লিকা দাদাকে বলেছে, ভালো হবে মনে হলে দেখতে পারো, কিন্তু কিচ্ছু গোপন করা চলবে না।

গোপন না করার সুযোগ প্রশান্তই করে দিয়েছে। মল্লিকার

দাদা বিয়ের প্রস্তাব করতে চুপচাপ ভেবেছে একটু। এ-রকম একটা প্রস্তাব আসবে সেটা আগেই অনুমান করতে পেরেছিল। বুকের তলার ক্ষোভ একটুও জুড়োয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েটা চোখ টেনেছে। রূপ সত্ত্বেও তারও হাব-ভাব যেন নমনীয় নয় একটুও। ভিতরের যন্ত্রণাটা তখন এমনই যে সর্বদাই একটা কিছু করে বসার তাড়না প্রশান্তর। কঠিন কিছুর ওপর আঘাত হেনে নিজেকেই আহত করার ঝোঁকের মতো। মল্লিকা যেন সেই কঠিন কিছু।

জিজ্ঞাসা করেছে, আপনার বোনের বয়েস কতো?

মল্লিকার দাদা জবাব দিয়েছে, ঠিক ঠিক বলতে পারি না, বছর ছাব্বিশ হবে।

প্রশান্ত আবার জিজ্ঞাসা করেছে, আপনাদের টাকার অভাব নেই, মল্লিকা দেখতে ভালো, লেখাপড়াও শিখেছে কিছু—এতদিন বিয়ে হয়নি কেন?

মল্লিকার দাদা তারপর অকপটেই সব বলেছে। আর, যা ভেবেছে তাই। প্রশান্ত সেই অঘটন একটুও বড় করে দেখেনি।

বিয়ে হয়ে গেছে।

…মল্লিকা নির্বোধ নয় একটুও। বিয়ের দিনকতকের মধ্যেই লোকটার অনেক আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয়েছে তার। ওকে পেয়ে লোকটা যেন আর কাউকে না পাওয়ার আক্রোশ মেটাচ্ছে। নিভৃতের মিলনটুকুও কেমন অশান্ত অসহিষ্ণু, প্রায় নিষ্ঠুর। স্বভাবতই তারও তখন মনে প্রশ্ন এসেছে দেশ-বিদেশ চষা এত বড় কৃতী এনজিনিয়ারের এতকাল দোসর জোটেনি কেন। তার লাগাম ছাড়া আসক্তির যে রূপটা দেখেছে এতকাল সেই লোকের রমণীশূন্য জীবন কাটানোর কথা নয়।

মনের কথা মনে চেপে রাখার মেয়ে নয় মল্লিকাও। প্রথম প্রথম অল্প-স্বল্প ঝগড়াঝাটি হয়েছে তার মদের নেশাটা দেখে। জিজ্ঞাসা করেছে, এই অভ্যেসটা কদ্দিনের?

প্রশান্ত জবাব দিয়েছে, খুব বেশিদিনের নয়…তবে এ অভ্যেসের খবর

তোমার দাদা রাখতেন।...অবশ্য এতটা দেখেননি, ইদানীং বেড়ে গেছে—

—বেড়ে গেল কেন, আমি আসার আনন্দে না শোকে ?

—না, তুমি আসার কিছুকাল আগে থেকেই বেড়েছে। কিন্তু তোমার তাতে কি অসুবিধে হচ্ছে ?

—অসুবিধে আর কি। তা কিছুকাল আগে থেকেই বা হঠাৎ বেড়ে গেল কেন ?

এই কেনর জবাব মল্লিকা একদিনে না হোক দিনে দিনে পেয়েছে। কখনো কোনো ক্ষোভের মুখে, কখনো বা কোনো নিবিড় মুহূর্তে রমার প্রসঙ্গে প্রায় সব কথা প্রশান্তই বলেছে তাকে। যা বলেনি তারও অনেকটাই মল্লিকা আঁচ করে নিতে পেরেছে।

রাগ ঘৃণা বা বিদ্বেষ না, সব শোনা এবং বোঝার পর মল্লিকা বরং এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করেছিল। এত বড় এক শিল্পী মালবী মিত্র, যার কোনো ছবি আসছে শুনলেই ওরা উন্মুখ হয়ে দিন গুণত —সেই মেয়েকে নিয়ে কিনা এই লোকের জীবনে এত বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। মালবী মিত্র ছিল সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে রমা মিত্র! মালবী মিত্রর নিখোঁজ হওয়ার উত্তেজনা আর বিস্ময় তখনো একটুও জুড়ায়নি—তার পিছনে এই ব্যাপার!

রাগ ঘৃণা বিদ্বেষ দূরে থাক, সমবেদনায় মল্লিকার বুকের ভিতরটা ভরে যেতে পারত যদি এই লোক ওর দিকটা একটুও বুঝে চলতে চেষ্টা করত। কিন্তু জানাজানি হবার পর প্রশান্তর স্বভাব আরো বিপরীত দিকে গড়াতে লাগল। ফলে মল্লিকার সর্বদাই মনে হত ও যেন একজনকে না পাওয়ার ক্ষোভ আর তৃষ্ণা মেটাবার উপলক্ষমাত্র। ফলে মেজাজ তারও একটু একটু করে বিগড়তে লাগল।

হ্যাঁ, মল্লিকা প্রশান্ত ঘোষকে তার নিজের সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিল। সেটাই প্রশান্তর বিরক্তির কারণ। ফলে খিটিরমিটির বাড়তেই থাকল। মল্লিকার তেজ কম নয়, মালবী মিত্রর প্রসঙ্গ তুলেও হুল ফোটাতো এক-একসময়। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তও ক্ষিপ্ত একেবারে।

মল্লিকার বুকের তলায় যন্ত্রণার আঁচড় বাড়তেই থাকল। কথায়

কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, মালবী মিত্রকে ছবিতে তো বেশ সুশ্রী আর ব্রাইট দেখাতো কিন্তু রমা মিত্রর রূপ কেমন ?

প্রশান্ত একটুও না ভেবে জবাব দিয়েছে, তার বাইরের রূপ তোমার তুলনায় কিছুই নয়··· তবে তার ভিতরেরও একটা রূপ আছে—মানে ছিল, যার তুলনা হয় না।

মল্লিকা হাসি মুখেই আবার জিজ্ঞাসা করেছে, কেন, আমার ভিতরের রূপ বুঝি খুব খারাপ ?

এবারেও একটু না ভেবে প্রশান্ত জবাব দিয়ে বসেছে, তোমার ভিতরে তো আমি কোনোদিন চেয়ে দেখিনি।

এই নিস্পৃহতাই মল্লিকাকে দিনে দিনে তাতিয়ে তুলেছে।

···আর এক রাতের ঘটনা। কি কারণে প্রশান্তর মেজাজ একটু ভালো ছিল সেদিন মল্লিকা জানে না। মদও খায়নি। স্ত্রীকে নিয়ে খুশি মনে একটা বিলিতি ছবি দেখে এসেছে। তারপর ভেতরটা যেন মানুষটার আরো আবেগে ভরপুর। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরের আলো নিভিয়ে একটা আকৃতি নিয়ে মল্লিকার শয্যায় এসেছে। মল্লিকা ভেবে পায় না হঠাৎ কি হল। আদরে আদরে তাকে অস্থির করে কাছে টেনে নিবিড় নিষ্পেষণে ধরে রেখেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতেও ভয়, পাছে এই অপ্রত্যাশিত সুখের রাতটা ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিন্তু ব্যর্থই হল। আর শাণিত আক্রোশে ব্যর্থ করল মল্লিকা নিজে। নিবিড় করে তাকে আরো কাছে টেনে আবেগ-ভরা স্বরে প্রশান্ত হঠাৎ বলে উঠল, তুমি রমা—তুমি আমার রমা হয়ে গেলেই তো আমি সেই আগের মানুষ হয়ে যেতে পারি—আজ সেই থেকে তোমাকে রমা ভাবতে ভাবতে দেখো কেমন অন্যরকম হয়ে গেছি।

আচমকা মাথায় বুঝি এক ঝলক রক্ত উঠে এলো মল্লিকার। বাহু-বন্ধন ছিঁড়ে ছিটকে শয্যা থেকে নেমে এলো সে। গলা দিয়ে অস্ফুট আগুন ঝরল।—তুমি অতি স্বার্থপর, অতি নীচ।

সেই ক'টি মুহূর্তের মধ্যেই প্রশান্ত আত্মস্থ হয়েছে। কিন্তু তৃষ্ণায় জ্বলছে সে, এই বিঘ্ন বরদাস্ত করতে চায় না। গম্ভীর আদেশের স্বরে

ডাকল, এদিকে এসো—

—তোমার কাছে আসব? লজ্জা করে না তোমার—লজ্জা করে না? বলতে বলতে মল্লিকা ঘর ছেড়েই চলে গেল।

নিভৃতের সান্নিধ্যে ছেদ পড়েছে সেই থেকে। প্রশান্ত বেপরোয়ার মতো নেশা করে, কোনোদিন বাড়ি ফেরে কোনোদিন বা ফেরেই না। দিনকে দিন তার স্বাস্থ্য ভাঙছে। মল্লিকার রমণী-সত্তাও সর্বদাই তিক্ত, তপ্ত। ফাঁক পেলে সেও হুল ফোটাতে ছাড়ে না।

দু'জনেই তৃষ্ণার্ত। মাঝে লবণাক্ত নদী।

···হৃদয়ের মরুপথে আর এক ভরা নদী ধারা হারিয়েছিল। এতকাল বাদে তার সন্ধান নিয়ে কলকাতায় ফিরল ভূতত্ত্ববিদ্ অবনীশ দত্ত। কিন্তু যে নাটকের ওপর যবনিকা পড়ে গেছে আবার সেটা তুলে জীবনসঞ্চার করতে গেলে সেটা প্রেতের প্রাণ হবে কিনা সে-চিন্তা মাথায় আসেনি।

ফিরে আসার পর আপিসের কাজকর্ম পর্যন্ত মাথায় উঠেছে তার। সুমিতার সঙ্গে পরামর্শ করে অনেক চেষ্টার পর প্রশান্তকে এক সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে ধরে এনেছে। তারপর সুদূর বিঠলের প্রতিদিনের প্রতিটি চিত্র তার চোখের সামনে তুলে ধরেছে। শুধু বন্ধুকে ওখানে পাঠানোর অনুমতি চাওয়াটুকু ছাড়া।

কিন্তু যে-রকম প্রতিক্রিয়া দেখবে আশা করেছিল সে-রকম কিছু দেখল না। চুপচাপ বসে শুনে গেল। তারপর উঠে ঘরের মধ্যে বারকয়েক পায়চারি করল।—এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দে তো সুমি।

সুমিতা জল এনে দিল।

জল খেয়ে প্রশান্ত গেলাসটা ফিরিয়ে দিতে দিতে ওর দিকে চেয়ে হাসল একটু। বলল, ভূতাত্ত্বিক তো দেখি সন্ন্যাসিনীর ভক্ত হয়ে উঠল, তোর মুখখানাও অত সীরিয়াস কেন? জবাবেব আশা না

করে অবনীশের দিকে ফিরল আবার, একদিন না একদিন শ্রীমতীর খবর পাব আমি জানতাম, তবে এই গোছের অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স আশা করিনি বটে। অ্যাকট্রেসদের নিজের জীবনের অভিনয়টা অনেক সময় ওইরকম সেনটিমেণ্টাল হয় শুনেছিলাম বটে। স্টীল, থ্যাঙ্ক্ ইউ।

সুমিতা আর অবনীশ দু'জনেই বিমূঢ় একটু। লোকটা নেশা-টেশা করে এসেছে বলেও মনে হল না। অথচ এতবড় একটা ঘটনা শোনার পরেও এতটুকু আলোড়ন দেখল না, কোনরকম উত্তেজনাও না।

পরের সন্ধ্যায় মল্লিকার টেলিফোন পেল হঠাৎ অবনীশ। তার ঠাণ্ডা অনুরোধ, একবার আসতে পারলে ভালো হয়, কিছু কথা আছে।

এ-রকম আহ্বান খুব কমই পেয়েছে। ভিতরে ভিতরে একটু উতলা হলেও অবনীশ সহজ সুরেই বলল, যেতে পারি, কিন্তু তোমার আসতে কিছু বাধা আছে?

—আপনি এলেই ভালো হয়···সুমিতাদিকেও নিয়ে আসতে পারেন।

সুমিতা শুনেই বলল, প্রশান্তদা কি আবার কাণ্ড করেছে কে জানে, ওই মেয়ে ডাকছে শুনে তো ভয় করছে।

অবনীশ বলল, চলো দু'জনেই দু'জনকে রক্ষা করব'খন।

উতলা বোধ করাটা স্বাভাবিক। ওই রূপসী মেয়ের সমস্ত গুণ যেন প্রশান্তর আত্মীয়-পরিজনের মাথায় অস্ত্র হয়ে নেমে আসার জন্য উদ্যত। তবে এটা ঠিক, সোজাসুজি নেমে কখনো আসেনি।

তার মুখোমুখি হওয়ামাত্র অবনীশ মনে মনে প্রমাদ গুণল। সমাচার আর যাই হোক, কুশল নয়। ভণিতা বাদ দিয়ে মল্লিকা সরাসরি তার কথা-প্রসঙ্গে চলে এলো।—আপনি বাইরে থেকে ফিরে এসে আপনার বন্ধুকে একটা খবর দিয়েছেন শুনলাম?

—প্রশান্ত বলল?

—হ্যাঁ।···শুনলাম আপনি নাকি এক সন্ন্যাসিনীকে দেখে মুগ্ধ একেবারে। আর মুগ্ধ হবার জন্যেই দু'একদিনের মধ্যে তিনিও যাচ্ছেন সেখানে। কবে পর্যন্ত ফিরতে পারবেন ঠিক নেই, তাই কর্তব্য বিবেচনায় কিছু টাকা রেখে যেতে এসেছিলেন।

অবনীশ এবারে ঠাণ্ডা মুখে প্রশ্ন করল, তা আমাকে ডাকলে কি জন্যে?

—বন্ধুর উপকার করার জন্য আপনি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন ঠিক বোঝা গেল না তাই···বিশেষ করে বন্ধুর মতি-গতি যখন আপনাদের থেকে ভালো কেউ জানে না···

কথা-বার্তার সুরেই সুমিতা গম্ভীর। অবনীশ ফিরে প্রশ্ন করল, তোমার কি ধারণা, মজা দেখার জন্য আমি ওকে খবরটা বলেছি?

মল্লিকা এতটুকু অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, আমি কিছু ধারণা করতে পারছি না বলেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

অবনীশ দত্ত এদের ভালো চায়, মঙ্গল চায়। তাই বিঠলের সমস্ত চিত্রটা মল্লিকার চোখের সামনেও আবার তুলে ধরল। এই থেকেই যদি ও বুঝে নেয় সে কি উদ্দেশ্যে কি করেছে। প্রশান্তকে সেখানে পাঠানোর অনুমতি নেবার কথাটাও এবারে জানালো।

মল্লিকা চুপচাপ বসে এক মনে শুনল সব। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি আশা করেন এই দেখা-সাক্ষাৎ করানোর ফলে আপনার বন্ধুকে খানিকটা ফেরানো যাবে?

—করি মল্লিকা, খুব করি। অবনীশ আন্তরিকভাবে বলল, খানিকটা কেন, সবটাই ফিরতে পারে এই আশা করি···ওই মহিলাকে স্বচক্ষে দেখলে আশা তুমিও করতে।

আবেদনের প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। মল্লিকার আচরণ কঠিন নয়, কিন্তু চোখে মুখে যেন একটা অসহিষ্ণু তাপ ছড়িয়ে আছে। বলল, আমার আশা করার কথা ওঠে কি করে, আপনাদের ওই মহিলা আমাকেও যাবার কথা বলেছেন কিন্তু আপনি আমাকে সেটা জানানোও দরকার বোধ করেননি।

অবনীশ সাগ্রহে বলল, তুমি যাবে? সত্যিই খুব ভালো হয়, আমি ব্যবস্থা করে দেব?

—থাক্। গলার স্বর যেন তপ্ত ব্যঙ্গ করল একটু।—আপনাদের উদ্দেশ্য যদি সফল হয় ভালো কথা, কিন্তু আপনার বন্ধুকে চিনতে এখনো কিছু বাকি আছে আপনার—যেভাবে তাকে ফেরাতে চান সেইভাবে

ফিরলে মল্লিকার নামে অনায়াসে আপনি কুকুর-বেড়াল পুষতে পারেন।

অবনীশ গাড়িতে বসেও চুপ। পাশে সুমিতা। একটু বাদে সুমিতা বলে উঠল, মেয়ে তো নয়, যেন আগুন একখানা।

অবনীশ কোনরকম মন্তব্য করল না।...একটা কথা মনে পড়ছে তার। রমা মিত্র বলেছিল, আপনার বন্ধুর কোনো একটা দিক ভালো করে চিনে না থাকলে মল্লিকা এতদিনে ডিভোর্স করত—এভাবে লেগে থাকত না। রমা মিত্র মল্লিকাকে দেখেনি কখনো, তবু তার এই উক্তি আজ হঠাৎ কেন মনে পড়ল অবনীশ দত্ত জানে না।

নিজের ডেরায় নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে রমা মিত্র। অনুমতি নিয়ে মংলু সর্দার একজনকে আনতে গেছে। সে এলো বলে।...রমা মিত্র—মালবী মিত্র দুই-ই মৃত। যে আসছে সে আর কাউকে দেখবে।

এলো। দেখল। কাকে দেখল রমা জানে না। কিন্তু প্রস্তুতি সত্ত্বেও সে যেন চমকেই উঠল একটু। এই মূর্তি কল্পনার বাইরে ছিল। ফর্সা মুখে নীলাভ ছোপ পড়েছে। পুরু লেন্সের ওধারে চোখ দুটো অনেক ছোট হয়ে গেছে। চোয়ালের দু'দিকে হাড় উঁচিয়ে আছে... মাথার ঝাঁকড়া চুলের আধাআধি পাকা। কাঁধে মস্ত একটা ঝোলা —পথের ধকলে ঠিক এই মূর্তি হয় না। পরনের ট্রাউজার আর শার্টও বিবর্ণ। আগে জানা না থাকলে এই মানুষকে চেনা যেত কিনা সন্দেহ। বাইরে থেকে মংলু সর্দার আর তার অনুচরেরাও এদিকেই চেয়ে আছে। এই রকম এক হতভাগা মূর্তি জুতোসুদ্ধু মাইজির ঘরে ঢুকে গেল এটা তাদের পছন্দ হল না। তারপর যে-ভাবে মাইজির দিকে চেয়ে আছে তাও ওদের অখুশির কারণ।

সেদিকে এক নজর তাকিয়ে রমা নির্দেশ দিল, তোমরা যাও মংলু। আমার ভাইসাহেবের জন্যে যেমন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলে, এই বাবুর জন্যেও তাই করবে।

ওরা চলে গেল। মাইজির ভাইসাহেবকে ওদের পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু কেন যেন এই লোকটাকে আদৌ মনে ধরেনি। কিন্তু মাইজির হুকুম অমান্য করার সাধ্যও নেই ওদের।

…পৃথিবীর বহু জায়গা ঘুরে সাত বছর বাদে প্রশান্ত ঘোষ কলকাতায় সেই এক সন্ধ্যায় অপলক চোখে তাকে দেখেছিল। তার বহু বছর বাদে আবার এই দেখছে। কিন্তু দু'বারের দেখার মধ্যে কত যে তফাত, রমা এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনুভব করেছে। সেই দেখার মধ্যে সাত বছরের প্রতীক্ষার মাধুর্য ঝড়ে পড়েছিল, এই দেখার মধ্যে এত বছরের অসংযত ক্ষোভ তার সর্বাঙ্গে আছড়ে পড়ছে যেন। সেই সঙ্গে অকরুণ উল্লাসও বোধহয়।

—বোসো। তোমার চেহারা খুব খারাপ হয়েছে।

প্রশান্তর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চুঁয়ে পড়তে লাগল। চোখেও।—আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, রমা মিত্র অর মালবী মিত্র?

—দুটোই মরেছে। বোসো।

কাঁধের ঝোলাটা মাটিতে নামালো। মুখে যেন ব্যঙ্গ উপছে উঠল, এক ঝলক।—দেন?…সন্ন্যাসিনী…না কি যেন বলছিল ওরা …মাইজি?

—হ্যাঁ।

—ওয়াণ্ডারফুল! অ্যাণ্ড রাদার সেফ! হ্যাঁ আমার চেহারা খুব খারাপ হয়েছে, স্বভাবচরিত্র আরো খারাপ হয়েছে, বাট হোয়াট এ ম্যাজিক, তুমি এ-রকম আছ কি করে? ওয়েট, আমার হিসেব ভুল হয় না, ইউ মাস্ট বি থারটি নাইন অর মোর—বাট ইউ লুক মাচ লেস্ দ্যান্ ট্যুয়েনটি নাইন! কি ভাগ্য আমার, তোমাকে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না তুমিই বটে!

রমা আরো সংযত। ওই চাউনি আর চাপা উল্লাস তার না চেনার কথা নয়। বলল, বিশ্বাস কোরো না…আমি নই। বোসো! এখানে তো চায়ের পাট নেই, অন্য কিছু খেতে দেব?

প্রশান্ত থমকালো একটু। তারপর আবার হাসতে লাগল।—তুমি

কিছুটা মালবী মিত্র কিছুটা আর কেউ—সব মিলিয়ে ওয়াণ্ডারফুল! ...কি বললে, খেতে দেবে? আমার আসল খাবার সঙ্গেই থাকে, তা'ছাড়া দু'দিনের পথ ঠেঙিয়ে আসতে কি-যে ক্লান্ত। ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বোতল বার করল একটা। দেখামাত্র রমা শিউরে উঠল। চোখে মুখে নিষেধের আকৃতি, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না।

বোতল খুলে বেশ খানিকটা কাঁচা মদ গলায় ঢেলে দিল। জ্বলতে জ্বলতে নামছে, চোখ মুখ তাই বিকৃত হল বারকয়েক। বোতলটা ঝোলায় ঢুকিয়ে হাতের উল্টো দিক দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে সামনের নির্বাক মূর্তির দিকে চেয়ে হাসল আর এক দফা। তারপর মোড়ায় না বসে দড়ির খাটিয়ার শয্যায় গিয়ে বসল। হাসছে অল্প অল্প আর খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। এই দেখারও একটা গ্লানি-মাখা স্পর্শ গায়ে ঠেকছে যেন রমার।

...প্রগল্‌ভ কৌতুক মাখা মুখে ক্লান্তির আমেজ নেমে আসছে। চোখ দুটোও বুজে আসছে। আই এ্যাম সো টায়ার্ড ডারলিং...রিয়েলি ...দু'রাত ঘুমুইনি।

শয্যায় শুয়ে পড়ল।—আমাকে ডেকে তুলো না, আই নিড্ সাম্ স্লিপ্—

মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রমা মিত্র দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুর মতো। দেখছে। সর্ব ব্যাপারে শুচিতা একটা মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু পথের ওই নোঙরা জামা আর ট্রাউজার নিয়েই লোকটা তার শয্যায় শুয়ে পড়ল —পায়ের জুতোও খোলা হয়নি—তা সত্ত্বেও গা ঘিনঘিন করছে না।

সন্তর্পণে জুতো জোড়া খুলে বাইরে রেখে এলো। চোখ থেকে পুরু চশমাটাও খুলে নিয়ে সরিয়ে রাখল। বালিশ নেই, একটা মোটা শতরঞ্জি ভাঁজ করে বালিশের মতো করে মাথার নীচে গুঁজে দিল। তখনই মদের কটু গন্ধ নাকে এলো।...এ জিনিস ওই হারে খেলে লিভারের কি দশা হয় জানা আছে। গরমে ঘুমন্ত মানুষের মুখ ঘেমে উঠেছে। একটা হাত-পাখা নিয়ে মোড়াটা শিয়রের কাছে টেনে বসল।

…অবনীশ দত্ত সবই বলে গেছল। তা সত্ত্বেও তার কল্পনার মানুষটা এতখানি হারিয়ে গেছে ভাবতে পারেনি। প্রশান্ত ঘোষের ঘুমন্ত প্রেত-মূর্তি দেখছে সে চোখের সামনে। একটা অসহ্য বেদনায় বুকের ভিতরটা টনটন করছে।

ঠাণ্ডা সংযমে বাঁধতে চেষ্টা করল নিজেকে।…মালবী মিত্র হারিয়ে গেছে। রমা মিত্র নেই। সে শুধু সেবিকা। সেবার প্রয়োজনে এই মানুষকে রামজী পাঠিয়েছেন। সে সেবা করবে।

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই বিঠলের স্থানীর অধিবাসীরা জেনে ফেলেছে, তাঁদের গাঁয়ে এক অদ্ভুত মানুষ এসেছে, যে ঠাকুর-দেবতা মানে না, মাইজির সঙ্গে সসম্মানে কথা বলে না, এন্তার দারু খায়, ফাঁক পেলে ওদের যুবতী মেয়ে বউগুলোর সঙ্গে রঙ্গরসে মেতে উঠতে চায়। এ-রকম একটা হতভাগা লোকের ওপর মায়ের কৃপা বা দরদের হেতু বোঝে না তারা। লোকটার আচরণে বেশ রুষ্ট হয়েই মাইজির কাছে তারা জানতে চেয়েছিল লোকটা কে।

মাইজি জানিয়েছে, একসময় মস্ত লোক ছিল আর খুব ভালো লোক ছিল…

তারা শুধিয়েছে, মস্ত লোক আর ভালো লোক এ-রকম হয়ে গেল কি করে?

—রামজীর ইচ্ছেয়…।

রামজী যার ওপর এমন অকরুণ, মাইজি তার ওপর এত সদয় কেন ওরা বুঝতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলে জবাব পায়, রামজীই পাঠিয়েছেন।

অতএব এই মেহমান মানুষটিকে ওরা অনেকটা ভয়ে ভয়েই বরদাস্ত করে। ওদিকে ভার্গব ডাক্তার সাহেবও ওদের উপদেশ দিয়েছে, তোমাদের মাইজির কথা শুনে চলো, লোকটার মাথার ঠিক নেই, সহ্য কোরো…।

কিন্তু লোকটার আচরণ সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছে এক-একসময়।

রমা মিত্রর সীঁথির সিঁদুরের আঁচড় প্রথম দিনই চোখে পড়েছে

প্রশান্তর। ছদ্ম বিস্ময়ে তাই নিয়েও বিঁধতে চেষ্টা করেছে তাকে। —এ আবার কি, নতুন কারো শুভাগমন ঘটে গেছে নাকি?

রমা জবাব দেয়নি। প্রশান্ত নিজেই যেন বুঝে নিয়েছে ব্যাপারখানা। বলেছে, ও, তুমি তো শুধু রমা মিত্র নও, মালবী মিত্রও···ছবিতে কতবার কত জনের জন্য সিঁদুর পরেছ, এর আর দাম কি তোমার কাছে।

রমা তার পরেও নিরুত্তর।

অনেক ব্যাপারে সে এমনি নিশ্চুপ থাকে বলেই প্রশান্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এক-একসময়। তার ঠাট্টা-বিদ্রূপও অশালীন হয়ে ওঠে। আরো বেশি মদ খায়। কলকাতা থেকে দুটো বোতল এনেছিল তাও নিঃশেষ। ফলে দরকার হলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে হেঁটে গিয়ে হাঁড়িয়া সংগ্রহ করে আনে। তাই গেলে। দুটো সপ্তাহ কেটে গেল।

রমা সেদিন না বলে পারল না, শরীরটা এভাবে মাটি করছ কেন?

—কেন, তোমার তাতে কষ্ট হচ্ছে?

—হচ্ছে। আমার যা প্রাপ্য আমি তাই পাচ্ছি, কিন্তু তুমি এ-রকম হয়ে গেলে কেন?

প্রশান্ত হা-হা করে হেসে উঠল।—মাইরি বলছি, তুমি ভাবছ মালবী মিত্র মরে গেছে, কিন্তু আমি দেখছি সে চমৎকার তরতাজা আছে।···যাক, আমার এই চালচলন তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

—না।

—তাহলে কি করতে বলো, চলে যাব?

—এই রকম করে চললে থেকে কি লাভ?

পুরু লেন্সের ও-ধারের দুই চোখ ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকল।—অন্যভাবে চললে তোমাকে লাভের আশা আছে?

···মানুষটার হাবভাবে এই গোছেরই ইঙ্গিত দিনে দিনে বাড়ছিল। আজ স্পষ্টই বলে বসল। ইদানীং সর্বদাই একজন করে লোক থাকে তার সঙ্গে। রমা এই রকমই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। পেটের ব্যথা উঠলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে কুঁকড়ে পড়ে থাকে—তাই। কিন্তু অন্য কারণও আছে।···যে-হারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে

তার জন্যেও প্রয়োজন। এই ডেরায় এলেও সেই লোক বাইরের দাওয়ায় বসে থাকে।

প্রশান্তর অনেক কথারই জবাব দেয় না। মুখ বুজে থাকে। কিন্তু এখন চুপ করে থাকল না। বলল, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি··· কিন্তু মল্লিকা কি দোষ করেছে?

—কে মল্লিকা? প্রশান্ত তপ্ত, বিরক্ত।

—তোমার স্ত্রী।

—তোমার হঠাৎ তার জন্য মাথা ব্যথা কেন?

—হওয়া উচিত বলে!

একটা কটুক্তি করে ওঠার মুখে কি মনে পড়তে থেমে গেল। হেসেও উঠল। বলল, মল্লিকা আর একটু কম সেয়ানা হলে অত কষ্ট পেত না। সে বুঝতে পেরেছিল আমার জীবনে মল্লিকা বলে কেউ নেই—যে আছে সে রমা।···যখন তার কাছে যেতাম, তাকে ছুঁতাম, তার ওপর অত্যাচার করতাম তখনো যে তাকে রমাই ভাবতাম এটা সে টের পেয়ে গেল। হাসতেই থাকল।

রমা স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুমি কলকাতা চলে যাও, সেখানে ভালো মতো চিকিৎসা করো—তারপর মল্লিকাকে নিয়ে এখানে এসো। যতদিন খুশি থাকো, আমার আপত্তি হবে না।

—তা না হলে আপত্তি করছ?

—করছি।

—কিন্তু তোমার এ-ভাবে থাকার ব্যাপারে যদি আমার আপত্তি হয়?

—হওয়া উচিত নয়।

প্রশান্ত ক্ষেপে উঠল, কাছে এগিয়ে এসে বলল, উচিত কাজ নিজের জীবনে ক'টা করেছ? ক'টা?

জবাব পেল না। পাবে না জানত যেন। সরোষে অপেক্ষা করল একটু তারপর তেমনি তপ্তস্বরে বলল, ঠিক আছে, আমি ভালো হব, তুমি যেমন বলবে তেমনি চলব, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে; এখান থেকেও অনেক দূরে চলে যাব আমরা—আমরা বেঁচে আছি

কি নেই কেউ জানবে না এত দূরে। রাজি আছ?

—না।

—কেন? এখানে তুমি দেবী আর মাইজি—তাই?

রমা নির্বাক। এই সংযমটুকুই যেন তার সামনে সব থেকে বড় পরীক্ষা এখন। তপ্ত চোখের ক্রূর অভিলাষ দেখছে।

প্রশান্ত হেসে উঠল আবার, ঠিক আছে, আর তাহলে আমার ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামিও না।

ঝোঁকের মাথায় পকেট থেকে মদের বোতল বার করেও থমকালো একটু। ক'দিন আগে রমা তাকে এখানে এ-সব খেতে নিষেধ করে দিয়েছে। প্রশান্ত ফুঁসে উঠেছিল, খেলে কি হবে?

রমা জবাব দিয়েছিল, আমার সঙ্গে তোমার এ-ঘরে দেখা হওয়া শক্ত হবে।

বোতলটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে পায়ে করে মাটিতে আঘাত করতে করতে সবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চার পাঁচ দিনের মধ্যে আর তার দেখা নেই। কিন্তু রমা তার প্রতিদিনের প্রতিটি ঘণ্টার খবর রাখে। মংলুর লোক অবাঞ্ছিত হুকুম পালন করে চলেছে। মদের মাত্রা আরো বাড়িয়েছে। হিংস্র আক্রোশে নিজেকে নিঃশেষের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অচল হলে পিছনের লোক আগলে রাখে। বিকল হলে ধরাধরি করে তারা হাসপাতালে এনে মহেশ্বর ভার্গবের হেপাজতে রেখে যায়।

রমা মিত্রর ভিতরটা হিম হয়ে আসছে। বাইরেটা পাথর।

সেদিন রাতে বৃষ্টি পড়ছিল অঝোরে। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। রমা চুপচাপ বসেছিল।

দরজা দুটো সজোরে ঠেলে প্রশান্ত ঘরে ঢুকল। রমা বিষম চমকে উঠল। তারপর উতলা। জামা ট্রাউজার ভিজে জবজবে। চান করে এসেছে একেবারে। চাউনিটাও কেমন ঘোলাটে আর অর্থপূর্ণ মনে হল তার।

রমা উঠে এসে বাইরে উঁকি দিল। না আর কেউ নেই। জলের

ছাঁট আসছে। দরজা বন্ধ করল আবার। তারপর মুখোমুখি দাঁড়াল।

প্রশান্ত নিঃশব্দে হাসছে।

এই হাসি রমা চেনে। এই চাউনিও। রমা স্থির ঠাণ্ডা। বলল, এ-ভাবে ভিজে এলে কেন?

প্রশান্ত পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি আমার পিছনে লোক লাগিয়ে রেখেছ কেন—ভয়ে? হাসছেই।—আজ তাদের কলা দেখিয়েছি, কেউ টের পায়নি।

রমা এগিয়ে এসে নিজের হাতে গায়ের জামার বোতাম খুলে দিল। তারপর ট্রাউজারে গোঁজা জামাটাও টেনে তুলল।—খোলো এটা।

প্রশান্ত যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। এক টানে জামাটা খুলে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

রমা বলল, গেঞ্জি খোলো।

প্রশান্ত তাই করল।

একটা গামছা হাতে করে রমা আবার কাছে এলো। নিজের হাতে গা হাত বুক পিঠ ভালো করে মুছে দিল।

এবার দড়ি থেকে নিজের একটা শাড়ি এনে তার হাতে দিল।—ট্রাউজার ছেড়ে ফেলো।

অদ্ভুত লাগছে প্রশান্তর। ঠাণ্ডা একটা ছোট ছেলে যেন। শাড়িটা দু'ভাঁজ করে কোমরে জড়িয়ে ভিজে ট্রাউজার ছেড়ে পায়ে করে সেটাও কোণে সরিয়ে দিল।

রমা উবুড় হয়ে বসে নিজের হাতে ভিজে জুতো জোড়াটাও খুলে দোরগোড়ায় রেখে এলো। তারপর হাত ধরে তাকে খাটিয়ার শয্যায় এনে বসালো। এবারে বেশ করে মাথাটা আর পা দুটো হাঁটু অবধি মুছে দিল।

প্রশান্ত অভিভূতের মতো বসেই রইল।

বাইরে বৃষ্টির তোড় বাড়ছে।

একটা পাত্রে খানিকটা দুধ গরম করে রমা সামনে এনে ধরল।—খেয়ে নাও।

প্রশান্ত যেন স্বপ্নের রাজ্যে আছে এখন। চাউনিটাও বদলে গেছে। দুধের পাত্র নিঃশেষ করে রমার হাতে দিল। রমা জলের গেলাস বাড়িয়ে দিতে তাও ঢকঢক করে খেয়ে নিল।

তারপর দু'জনেই নির্বাক খানিকক্ষণ!

প্রশান্তর স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল বুঝি। বাস্তবে ফিরল। আত্মস্থ হল।—তারপর?

—কি তারপর?

—এই বৃষ্টি যদি সমস্ত রাতে আর না থামে।

—এখানেই থাকবে। রমা নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা।

—আর তুমি?

চোখে চোখ রেখে রমা চেয়েই রইল একটু। তারপর আঙুল দিয়ে কোণের রামজীর পটখানি দেখিয়ে দিল। —ওইখানে।

অর্থাৎ ওখানে তার আশ্রয়।

মুহূর্তের মধ্যে নতুন অনুভূতির রেশটুকুও তছনছ হয়ে গেল বুঝি। চাউনি ঘোরালো আর ধারালো হয়ে উঠল। চোখের তাড়ায় সেই ক্রুর অভিলাষ ফুটে।

—তোমাকে ওখানে থাকতে দেব বলে তোমার চেলা-চামুণ্ডাদের চোখে ধুলো দিয়ে জলে ভিজে এখানে এসেছি আমি—কেমন?

রমা যেন জানত এইরকম একটা মুহূর্ত আসবে। সে নিশ্চল, স্থির। জবাব দিল না।

প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল।—তুমি কলকাতায় ডাঁহা মিথ্যে কথা বলে আমার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলে কেন? কেন কথা রাখতে পারনি? ক'জন এসেছিল তোমার দরজায়?

রমা নিরুত্তর। ঠাণ্ডা পাথর-মূর্তি।

—চুপ করে আছ কেন? তোমার পালানোর কারণ আমি জানি না? আসেনি কেউ?

—এসেছিল।

প্রশান্ত হেসে উঠল। তারপরেই খপ করে তাঁর দুই কাঁধ ধরে

সজোরে বুকের ওপর টেনে নিল।—তাহলে আর একজন বাড়লে এমন কি ক্ষতি? শুধু আমার বেলাতেই তোমার সতীত্ব কেন?

বলতে বলতে দুই বাহুর নিষ্পেষণে নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল ওকে। রমণীর দুই অধর বিদীর্ণ করার হিংস্র উল্লাসে মেতে উঠল যেন।

রমা তেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি পাথর।

আর সেই জন্যই যেন আরো হিংস্র আর নৃশংস হয়ে উঠল প্রশান্ত ঘোষ। জ্বলন্ত চোখে তাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আচমকা ধাক্কায় ওই খাটিয়ার ওপরে ঠেলে দিল।

নিস্পন্দ তারপরেই।

দরজায় করাঘাত।—মাইজি! মাইজি!

এখনো ঠিক তেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি পাথর-মূর্তি রমার। সে যেন জানত এইরকমই ঘটবে কিন্তু। প্রশান্তর চোখে চোখ রেখে খাটিয়া ছেড়ে উঠল আস্তে আস্তে। নেমে এলো। বেশ-বাস একটু বিন্যস্ত করে নিয়ে নিজে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

হোগলা মাথায় মংলু আর আরো দুটো লোক দাঁড়িয়ে।

মংলু জানালো, বংগালীবাবুকে সন্ধ্যে থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—এখানে আছেন নিয়ে যাও।

ভিতরে উঁকি দিয়ে মংলু সর্দার অবাক। মায়ের মুখখানাও অস্বাভাবিক কঠিন লাগছে তার।

—চলিয়ে বাবুজী।

—আর শোনো, মংলুর দিকে চেয়েই রমা আবার বলল, বাবুজী কাল চলে যাচ্ছেন এখান থেকে···ব্যবস্থা করে দিও।

—জি মা-ই।

প্রশান্ত ঘোষ রমার দিকে চেয়ে আছে। পুরু লেন্সের ওধারে চোখ দুটো খুব ছোট দেখাচ্ছে।

তারপর এগিয়ে এসে মংলুকে ঠেলে সবেগে বাইরের বৃষ্টিতে আর

অন্ধকারে মিশে গেল সে।

রমা তেমনি পাথর তখনো।

সেবারের মতো চলেই গেল প্রশান্ত ঘোষ। কিন্তু তিন মাস না যেতে আবার এলো।

তারপর এমনি আনাগোনা চলল। গত আড়াই বছরের মধ্যে কম করে পাঁচ ছ'বার এসেছে আর গেছে।

প্রতিবার তার আক্রোশ বেড়েছে বই কমেনি। আচরণ আরো উদ্‌ভ্রান্ত। মদ খাওয়া বেড়েই চলেছে। শরীর আরো ভাঙছে। কিন্তু এতবারের মধ্যে একটি দিনের জন্যও রমার ঘরে আর যায়নি। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তখনই শুধু রমার দেখা মিলেছে। আর নির্দয় আনন্দে প্রশান্ত তখন হেসেছে।

...রমার চোখের সামনে কালো ছায়া নেমে আসছে একটা। প্রাণপণে সেটা ঠেলে সরাতে চায়।

পারে না। উল্টে সেটা ঘন হচ্ছে। জমাট বাঁধছে।

প্রশান্ত হাসপাতালে আছে। যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যায়। কখনো বা ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রাখতে হয়। রমার স্থিরতার বাঁধ ভেঙে আসছে। তার পুজো যেতে বসেছে, রামজীর সেবা যেতে বসেছে। এই নীরব ছটফটানি প্রশান্ত অনুভব করতে পারে। সে হাসে।

রমা বলে, তুমি এভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছ কেন? মল্লিকার কাছে ফিরে যাও, তোমার বন্ধু আর সুমিতার কাছে ফিরে যাও।

প্রশান্ত হাসে। এটুকুই যেন দেখতে চেয়েছিল। পাথরের এই প্রাণটুকুই। বলে, সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে, আর নড়ার ইচ্ছে নেই।

এক কথা বারবার বললে আবার রেগেও যায়। বলে, কোন্‌টা যে তোমার অভিনয় কোন্‌টা নয় বোঝা দায়।

...যন্ত্রণার ঘোরে একদিন বলেছিল, তোমার ভুলই বা কি আর ক্ষমাই বা কি। একটা দুটো ছেলেপুলে হলেই শুনি কর্তার দিকে

আর তেমন মন থাকে না গৃহিণীর। একটা দুটো ছেড়ে তোমার তো ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেমেয়ে। তোমার জগতে আর আমার জায়গা হওয়া দূরের কথা, আমি তোমার চক্ষুশূল এখন আমার জন্য তোমার মাতৃগর্ব খর্ব হচ্ছে সেটা আমি বেশ বুঝি।

রমা নির্বাক। তার বুকের তলায় শুধু এক অব্যক্ত যন্ত্রণা।

মহেশ্বর ভার্গব রমাকে জানালেন, রোগীকে কলকাতায় অথবা শহরের কোনো বড় হাসপাতালে সরানো দরকার, এরপর হয়তো, খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

…মাঝ রাতে হাসপাতাল থেকে নিজের ডেরায় ফিরল রমা। নিজেকে আবার ঠাণ্ডা সংযমে বেঁধে অবনীশ দত্তকে চিঠি লিখল একটা। লিখল, আপনার বন্ধু অসুস্থ। তাঁকে এখান থেকে সরানো দরকার…

সেই দীর্ঘ চিঠি।

তবু দেরিই হয়ে গেল। তোড়জোড় করে অবনীশের কলকাতা থেকে বেরুতে দিন পনের সময় লেগে গেল।

সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার, রমা মিত্রর চিঠিখানা মল্লিকাকে দেখাতে সে ওটা আদ্যোপান্ত পড়েছে, তারপর বলেছে, আমি যাব।

এসেছে।

…এক উদ্‌ভ্রান্ত জীবন তখন ধীর অমোঘ গতিতে মহাশান্তির পথে পা ফেলেছে।

মল্লিকাকে নিয়ে অবনীশ এসে দাঁড়াল যখন, হাসপাতালের ঘর সেই আসন্ন মহাশান্তির স্তব্ধতায় সমাহিত।

শিয়রের কাছে পাথরের মূর্তির মতোই রমা মিত্র বসে। প্রশান্তর নাকে অক্সিজেনের নল গোঁজা।

রমা চোখ মেলে দেখল তাদের। তারপর শুধু মল্লিকাকে।

রোগীর মুখ থেকে মল্লিকার বিমূঢ় দুই চোখও আস্তে আস্তে রমার

মুখের ওপর উঠে এলো।

দু'দিক থেকে দুই রমণী দু'জনকে দেখছে।

মাঝখানে শান্তিপথযাত্রী।

রমা নিঃশব্দে উঠল। তারপর পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আরো চারটে দিন বেঁচে ছিল প্রশান্ত ঘোষ।

মাঝে দুই একবার জ্ঞানও ফিরেছিল। অবনীশকে চিনেছে। মল্লিকাকেও। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখার মতো পড়েছে। বিড়বিড় করে বলতে চেষ্টা করেছে, তুমিও এসেছ···

চোখ ঘুরিয়ে আরো একখানা চেনা মুখ খুঁজেছে। তাকে দেখতে পায়নি।

হাসপাতাল থেকে রমা মিত্রর কাছে বারবার খবর গেছে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় রাত্রিতে। কিন্তু সে ডেরায় নেই। মন্দিরে। মন্দিরের দরজা বন্ধ। ডেকেও সাড়া মেলেনি।

মৃত্যুর আগের রাতে প্রশান্ত ঘোষ একটু স্পষ্ট করে কথাও বলতে পেরেছিল। অবনীশকে বলেছিল, একটা আস্ত পাগল ভালোবাসার কাঠগড়ায় গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল···তাই না···

ভোর রাতে সে চোখ বুজেছে।

শব দাহ হয়ে গেছে। অমৃত গঙ্গার ধার থেকে যে-পথ ধরে এলে মাঝে রামজীর মন্দির পড়ে, মল্লিকাকে নিয়ে সেই পথ ধরেই ফিরছিল অবনীশ। মল্লিকা বাক্‌শক্তিরহিত কাঠের মূর্তি।

মন্দিরের সামনে এসে অবনীশ দাঁড়াল। দরজা খোলা।

ভিতরে কেউ নেই।

···হাসপাতালের ওই ঘরেই আরো একটা দিন কাটল। অন্য রোগী ছিল না। শুধু অবনীশ আর মল্লিকা ছিল আর বুড়ো ডাক্তার মহেশ্বর ভার্গব ছিলেন।

পরের দিন অবনীশ ফেরার জন্য প্রস্তুত হল। মহেশ্বর ভার্গব জিজ্ঞাসা করলেন, মাইজির সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

অবনীশ নির্লিপ্ত জবাব দিল, কি দরকার···আপনি বলে দেবেন।

দু'দিনের মধ্যে এই প্রথম কথা বলল মল্লিকা। স্পষ্ট মৃদু স্বরে বলল, না, আমি তাঁর কাছে যাব।

অগত্যা অবনীশ নিয়ে চলল তাকে। সঙ্গে মহেশ্বর ভার্গব। সর্দার আর তার সঙ্গী-সাথীরাও। তাদের কাছে সবাই যেন একটা দুর্বোধ্য বিষয়।

রমার ঘরের দরজা খোলা। দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল সকলে।

তারপর একটা আচমকা আঘাতে বুড়ো ভার্গব আর মংলু সর্দার আর তার অনুচরেরা একসঙ্গে চমকে উঠল। ঘরের মধ্যে তাদের মাইজি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। তার বিধবার বেশ। সীঁথি খরখরে সাদা।

একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে এতদিনে তারা বুঝল, কে চলে গেল।

পায়ে পায়ে মল্লিকা একাই ঘরে ঢুকল। কাছে এসে দাঁড়াল। খুব কাছে এসে দাঁড়াল। খুব কাছে। অপলক চেয়ে আছে। মল্লিকা পাথর-মূর্তি দেখছে একখানা।

খুব ধীরে খুব স্পষ্ট স্বরে বলল, একজন এখানে বারবার এসে মাথা খুঁড়েও তোমার আশ্রয় পেল না···আমাকে ফেরাতে পারবে?

পাথরের মূর্তি কেঁপে উঠল প্রথম। তারপর এক অব্যক্ত আকূতিতে দু'চোখ ভরে উঠতে লাগল। দু'হাতে মল্লিকাকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল।

তার কোলে মুখ গুঁজে ছোট মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মল্লিকা।

···ষোল বছরের জমাট কান্নার ধারা নেমেছে রমা মিত্রর দুই গাল বেয়ে।

বাইরের কোনো এক জোড়া চোখও শুকনো নয়।